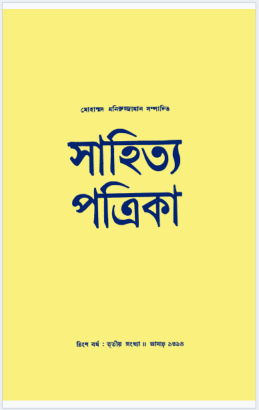

Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.7
Pages	159-202
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী

বিশ্বজিৎ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দিলে, এ-কথা বলা অসঙ্গত হবে না, বিষয়-ভাবনা ও প্রকরণ-প্রকৌশলে, প্রথমার্ধ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা নাটকে নেই প্রাগ্রসরতা কিংবা শতাব্দী-ভেদ---বলতে গেলে সবই উনিশ শতকী, প্রথাশ্রয়ী, সনাতনপন্থী এবং একমুখী। কাব্য-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অগ্রগতির সমান্তরাল হলেও, বাংলা নাটক কখনোই ছিল না ঐ গৌরব-প্রত্যাশী। 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫১) থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত কালখণ্ডে, গভীরতর পরীক্ষণে বলতেই হয়, বাংলা নাটক বিকশিত হয়েছে চারটি প্রবণতাকে আশ্রয় করে---১. জাতীয়তাবাদ (কখনো তা আবার সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়-চেতনাশ্রয়ী) উন্মেষের জন্য ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পুরাণ মন্থন করে রচিত নাটক; ২. সামাজিক-পারিবারিক অসঙ্গতি থেকে মুক্তির অভিলাষে রচিত হাস্যরসাত্মক প্রহসন; ৩. বাস্তব-অবাস্তব কাহিনী-আশ্রয়ী সামাজিক নাটক; এবং ৪. 'গণনাট্য সংঘ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত-মঞ্চায়িত সংগ্রামশীল জীবনাশ্রয়ী সমাজবাদী বক্তব্য-ঋদ্ধ নাট্যধারা। পুনরুক্তি হলেও, আবারো বলতে হচ্ছে, এ-ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছেন একজন, প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো বিস্তৃত সৃষ্টিছায়াপ্রসারী একজন, তিনি রবীন্দ্রনাথ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) হাতে সৃষ্ট ইতিহাস-নির্ভর নাটকীয় ফর্ম এবং সামাজিক অসঙ্গতি-শোধনার্থে প্রাহসনিক রূপকল্প শতাব্দীব্যাপী অবলীলায় অনুসৃত হয়েছে। এই দ্বৈত-স্রোতের সঙ্গে তৃতীয় মাত্রা, সমাজ ও মৃত্তিকা-সংলগ্নতা বাংলা নাটকে আনলেন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)। বিষয়বস্তুতে যেমন, তেমনি প্রকরণ-পরিচর্যা এবং গঠনশৈলীতে বাংলা নাটকে দীর্ঘ দিন এই ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল প্রবহমান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) কি

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৭৭-১৯১২), একজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কি একজন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯৩৭), কনটেন্ট ও ফর্মে, প্রতিভা সত্ত্বেও, প্রয়াসী ছিলেন না নতুন মাত্রা সংযোজনে। অনস্বীকার্য যে সময় ও সমাজ তাঁদের অনুকূলে ছিল না। কিন্তু তাঁদের উত্তরসুরিরাও বিচরণ করতে চাইলেন ঐ গতানুগতিক সহজ আবর্তে। ফলে জাতীয়তাবাদ বিকাশের নামে, আমাদের নাট্যকাররা অধিক মাত্রায় ব্যস্ত থাকলেন হিন্দু অথবা মুসলিম সম্প্রদায়চেতনা বিকাশে; কিংবা কখনো মাইকেল-দীনবন্ধু সৃষ্ট-ধারায় প্রহসন-নির্মাণে। বাংলাদেশের প্রাথমিক যুগের নাট্যকাররাও ছিলেন না এর ব্যতিক্রম। তাঁদের হাতেও, সাফল্য-ব্যর্থতা মিলে, উপর্যুক্ত চতুর্ধারায় রচিত হলো অনেক নাটক। বিশ্ব নব-নাট্যাঙ্গন সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হলেন না, থাকতে চাইলেন উনিশ-শতকী আবহে; বিষয় ও প্রকরণে তাঁরা পূর্বসুরিকেই আঁকড়ে থাকলেন পরম নির্ভরতায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে নতুন জীবনভাবনা ও শিল্পবোধে জাগ্রত বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার, সমকালীন ভারতীয়-বঙ্গের ব্যতিক্রম-সৃষ্টিকারী আধুনিক নাট্যকারের মতোই, বাংলা নাটকে বিষয়ভাবনা ও নির্মাণকলায় আনলেন পাশ্চাত্যের নব-নাট্যাঙ্গনের কিছু মৌল-প্রবণতা। আমাদের দৃষ্টিতে, বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে যাঁরা নতুন প্রাণধর্ম ও রূপশৈলী নির্মাণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন—নুরুল মোমেন (১৯০৮-), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) এবং সাঈদ আহমদ (১৯৩১-)। মেধাবী, আন্তর্জাতিক-মনস্ক, শিক্ষিত এবং পরিস্রুত জীবনভাবনায় বিশ্বাসী এই পাঁচজন নাট্যকার সচেতনভাবে পাশ্চাত্য নাটকের আধুনিক কলা-প্রকৌশল বাংলা নাটকে সংযোজন করেছেন শিল্পিত স্বরগ্রামে। এই পঞ্চ-প্রতিভার পাঁচটি ব্যতিক্রমধর্মী নাটক আমরা বিবেচনা করবো; দেখাতে চাইবো বাংলাদেশের নাট্যধারায় তাঁদের স্বাতন্ত্র্য এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিক প্রাতিস্বিকতা ও কলাবোধের প্রাগ্রসরতা, তাঁদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা।

২

বিষয়বস্তু, জীবনদৃষ্টি, গঠনশৈলী এবং উপস্থাপনা-রীতির পরীক্ষায়, সাফল্য ও সিদ্ধিতে, নুরুল মোমেনের অবদান বাংলা নাটকের ধারায়

বিশিষ্ট ও ব্যতিক্রমধর্ম-চিহ্নিত। মাত্র একটি নাটক তাঁকে এনে দিয়েছে প্রাতিস্বিক সৃষ্টি-ক্ষম-প্রজ্ঞার অভিধা ; বাংলা নাটকের প্রথা-স্থবির ধারায় মাত্র একটি নাটক নিয়ে এসেছে আধুনিক পাশ্চাত্য নাটকের স্বাদ-সৌরভ-সাধর্ম্য। আমরা নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' (১৯৪৮) নাটকের কথা বলছি। গঠনশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে 'নেমেসিস' বাংলা নাটকের ধারায় স্বয়ংস্বতন্ত্র, অদ্বিতীয় এবং অনতিক্রান্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ এবং চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'নেমেসিস' একাঙ্কিকার অবয়ব। সুরজিত নন্দী নামের এক স্কুল শিক্ষক, ক্রিস্টোফার মার্লোর (১৫৬৪-১৫৯৩) ফস্টাসের মতো, বিবেক বিসর্জন দিয়ে কিভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে এবং অবশেষে রক্তাক্ত পথযাত্রা সমাপ্তিতে আত্মহননে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে—তারই শৈল্পিক শব্দপ্রতিমা 'নেমেসিস'। নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় অনুধাবনের জন্য, আমরা তুলে আনতে চাই, সুরজিত নন্দীর শ্বশুর নৃপেন বোসের লেখা একটা চিঠির কিছু অংশ :

> সুলতার সঙ্গে তোমার গোপনে বিবাহ দিয়েছি বিশেষ কোনরূপ অনুষ্ঠান না করেই। কারণ যদি তুমি তিন মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা না করতে পার তবে তোমার এ-বিবাহ অস্বীকৃত হবে। আমাদের সমাজে এরূপ ব্যাপার চালু। এবং সুলতাতে যখন আমারই রক্ত বইছে, তখন তারও অমত হবে না জেনো। অল্প-দিন সংসার করেছ বলে মনে করোনা তার মনের উপর তুমি অধিকার বিস্তার করেছ। তোমার মত তাকে দিয়েও প্রতিজ্ঞা করিয়েছি, তিন মাস তোমার সঙ্গে তার সংশ্রব না রাখতে। ঝুনরমল ও অসীমের সাহায্য পেলে এই সময়ের মধ্যে পাঁচ লক্ষ টাকা করা কোন অসম্ভব প্রস্তাব নয়। বিবেকটাকে সাপের খোলসের মত ত্যাগ করে নতুন হয়ে বেরিয়ে এসো। সময়ে আবার খোলস পড়বে। এ বর্ণচোরার দেশে মহারথীদের সামিল হওয়ার ঐ একই পন্থা।[১]

—শ্বশুরের নির্দেশ মতো, তিন মাসে পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য সুরজিতকে বিসর্জন দিতে হলো বিবেক ; মানুষের মুখের অন্ন নিয়ে শুরু করলো পৈশাচিক ব্যবসা। সে নিজেই তার অধঃপতন-যাত্রার

কথা স্বীকার করেছে, "Faustus তার আত্মা শয়তানকে বিক্রি করেছিল একইবারে, আর আমি আমার আত্মাকে কিস্তিবন্দী করে নৃপেন বোস আর অসীমের কাছে বিক্রি করেছি স্যর।"[২] কিন্তু নাটকের সমাপ্তিতে সুরজিতের মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হয়েছে বিবেক, এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে পরিসমাপ্তি টেনেছে ঘৃণ্য-জীবনের, সন্ধান পেয়েছে সে আত্মমুক্তির।

আত্ম-উন্মোচন, আত্ম-খনন এবং আত্ম-আবিষ্কারের সাধনায় সুরজিত নন্দী বাংলা নাটকের ধারায় এক অনন্য চরিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আত্ম-উন্মোচন, আত্মখনন এবং স্বীকারোক্তিমূলক যে-সাহিত্য-ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলা নাটকে তা শৈল্পিক স্বরগ্রামে সংযোজিত হলো নুরুল মোমেনের হাতে। আত্মবিচ্ছিন্ন-সমাজবিচ্ছিন্ন-সত্তাবিচ্ছিন্ন-বিধাতাবিচ্ছিন্ন সুরজিত নন্দী নাটকে তার নরক-যাত্রার ইতিহাস বর্ণনা করেছে। সমাপ্তিতে প্রতিহিংসার দেবী Nemesis নেমে এসেছে সুরজিতের জীবনে ; তখন থেমেছে তার হার্দিক অগ্ন্যুৎপাত, পেয়েছে সে বন্দী-সত্তার স্বাধীনতার স্বাদ :

> আঃ কী গভীর শান্তিতে আমার সর্ব সত্তাকে স্নান করিয়ে দিলে, ভগবান। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমার কি উপকার করেছ। আমার সঙ্গে সুলতার দেখা হলো না, সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমি জীবিত থাকলে সে এসে দেখতো তার সুরজিত মরে গেছে। আমি মরে যাওয়ায় সুরজিত জীবিতই রইল। সুলতার প্রার্থনা বৃথা যায়নি—আমার হীন অর্থ আমার বংশকে কলঙ্কিত করবে না। I paid the penalty with my life and saved my generations.... আঃ, শেষ সময়টা কি পরম শান্তিতে ভরে দিলে।[৩]

'নেমেসিস' নাটকের গঠনকৌশল ও মঞ্চ-বিন্যাস-রীতি বাংলা নাটকের ইতিহাসে অভিনব, অনন্য এবং অনতিক্রান্ত। নাট্যকার সচেতনভাবে এখানে পাশ্চাত্য নাটকের Exposition, Rising action, Climax, Falling action এবং Denouement নামক পঞ্চ-সন্ধির পঞ্চাঙ্ক-রীতি বর্জন করেছেন। এ-নাটকে এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের দ্বন্দ্ব নেই, নেই কোন ভাবদ্বন্দ্ব ; বরং এটি একান্তই কেন্দ্রীয়

এবং একমাত্র চরিত্র সুরজিত নন্দীর হার্দিক রক্তক্ষরণ আর যন্ত্রণাময় অন্তর্দ্বন্দ্বের শিল্পভাষ্য। জ্ঞান ও সাহিত্য মানুষকে ত্রিকালজ্ঞ করতে পারবে না জেনে ক্রিস্টোফার মার্লোর ফস্টাস যেমন অনুগামী হয়ে ওঠে শয়তানের এবং পরিণামে ভোগ করে গভীর মর্মযাতনা; তেমনি সুরজিত নন্দী অর্থ সংগ্রহের পৈশাচিক নেশায় বিবেক-বিসর্জন দিয়ে হয়ে ওঠে অমানুষ এবং এক সময় পরম যন্ত্রণা আর দুর্ভর বেদনার মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় জীবনের সমাপ্তি-প্রান্তে। ফস্টাসের মতো সুরজিত নন্দীও জীবনকে অস্বীকার করে জীবন পলাতক হতে পারেনি, তাই সমাপ্তিতে জীবনের জন্য, হারানো বিবেকের জন্য, মুক্তির জন্য, আত্মতৃপ্তির জন্য তার আকুতি, উৎকণ্ঠা আর অন্তর্গত অগ্ন্যুৎপাত তরঙ্গময় হয়ে উঠেছে। আপাত-দৃষ্টে পঞ্চ-সন্ধির পঞ্চাঙ্ক-রীতি এ-নাটকে নেই; কিন্তু সুরজিত নন্দীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত বেদনাজর্জর পরিণতির পথ-পরিক্রমাকে আমরা পঞ্চাঙ্ক নাটকের ছকে ফেলে বিন্যাস করতে পারি। এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে নাটকের 'পূর্বাভাষ'-এ লেখকের ভাষ্য: "এই এক অংকের নাটকটিকে এক চরিত্র-সর্বস্ব করা সত্ত্বেও ক্লাসিক্যাল নাটকের পাঁচ অঙ্কের ক্রম-পরিণতির ছকে ফেলে লেখার আঙ্গিক এটাতে লক্ষ্য করা হয়তো কঠিন হবে না।"[৪]

'নেমেসিস' নাটকের এই অভিনব সাংঠগনিক স্বাতন্ত্র্য অধিকাংশ নাট্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনেকেই প্রয়াস পেয়েছেন এর অবয়বকৌশল বিশ্লেষণে। কিন্তু যথার্থ অর্থে, কোন সমালোচকই এর গঠন-কৌশল বিশ্লেষণে পরিশ্রমী হননি। তবু, দেখা যাক, পূর্বসুরির বিশ্লেষণ:

ক. সজনীকান্ত দাস

> ...দেড় ঘন্টা ধরে এই এক-চরিত্র একাঙ্ক নাটকটি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনলাম এ কথা বললে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এতখানি গভীর অনুভূতি বাঙলা সাহিত্যে দেখিনি।[৫]

খ. মোহিতলাল মজুমদার

> সত্যই ...এই রচনাটি একটি অতিশয় অভিনব কলা-কৌশলের পূর্ণ সাফল্য ঘোষণা করিতেছে।[৬]

গ. আশুতোষ ভট্টাচার্য

'নেমেসিস' একটি দীর্ঘ একাঙ্ক নাটক। ইহার রচনাশৈলী অপূর্ব। 'নেমেসিসে'র পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অভিনব এবং একটি মাত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বই নাটকটির মূল বিষয়। এই একটিমাত্র চরিত্রের দীর্ঘ সংলাপের ভিতর দিয়া সমগ্র নাট্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে এবং সার্থকভাবেই একটি চরিত্রের পরিপূর্ণ ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।[৭]

ঘ. কবীর চৌধুরী

'নেমেসিস'-এ বাংলা নাটকের অঙ্গনে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার চিহ্ন নির্ভুলভাবে উপস্থিত। মঞ্চে আমরা শুধু একটি চরিত্র দেখি, একটি চরিত্রের কণ্ঠ শুনি, কিন্তু তার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রের সম্পর্ক, লোভের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শুভবুদ্ধি ও বিবেককে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে সে কিভাবে সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, তার রূপায়ণে নুরুল মোমেন সবিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ...অত্যন্ত আবেদনময় ভঙ্গীতে কাহিনী নতুন নতুন মোড় নেয় এবং ধ্রুপদী গ্রীক নাটকের অপ্রতি-রোধ্যতা নিয়ে নায়কের উপর নেমেসিস নেমে আসে।[৮]

ঙ. মুহম্মদ মজির উদ্দীন

বাংলা নাটকের আঙ্গিকের পরীক্ষায় 'নেমেসিস' অভিনব;... ক্রিস্টোফার মার্লোর 'দি জিউ অব মাল্টা' (১৫৮৯) নাটকের অনন্ত ধনলিপ্সার ছায়াপাত ঘটেছে 'নেমেসিস' নাটকে। বারা-বাসের মৃত্যু ও সুরজিত নন্দীর মৃত্যুর চিত্র অনেকখানি এক। ...'নেমেসিস'-এর আখ্যানভাগ দৃঢ়সংবদ্ধ ও গতিশীল, পরিবেশ বাস্তব নিখুঁত ও পরিচ্ছন্ন। একমাত্র চরিত্র সুরজিতের সংলাপে দু'ঘণ্টা ব্যাপী নাটকের গতি ও উৎকণ্ঠা কখনোই ব্যাহত হয়নি। কাহিনী সংগ্রন্থনে দক্ষতা আছে, চাতুর্য আছে এবং একটি ক্ল্যাসিক সৌকর্য আছে।[৯]

—লক্ষণীয়, সব সমালোচকই 'নেমেসিস' নাটকের সংগঠন সম্পর্কে অভিনবত্বের কথা বলেছেন, ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক ট্র্যাজেডি নাটকের সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথা বলেছেন, কিন্তু এই অভিনবত্ব, এই সাদৃশ্য কেউই ব্যাখ্যা করেননি।

'নেমেসিস'-এর নাট্যিক বিন্যাসকে আমরা নাট্যকারের ভাষ্য অনুযায়ী অদৃশ্য পঞ্চ-সন্ধির বিভাজনে বিন্যস্ত করতে পারি—

ক. Exposition : পট-উন্মোচন থেকে আরম্ভ করে এয়াকুবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা পর্যন্ত (পৃ. ১ থেকে পৃ. ১৯);

খ. Rising action : রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ থেকে Magic Mirror সম্পর্কে রঞ্জিতের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত (পৃ. ১৯ থেকে পৃ. ২৭) ;

গ. Climax : Magic Mirror সম্পর্কে আলোচনা থেকে স্নেহলতার ট্র্যাজিক পরিণতি উল্লেখ পর্যন্ত (পৃ. ২৭ থেকে পৃ. ৪৫) ;

ঘ. Falling action : টেলিফোনে অসীমের সঙ্গে কথা বলা থেকে মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলার পূর্ব পর্যন্ত (পৃ. ৪৫ থেকে পৃ. ৫৭) ;

ঙ. Denouement : মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে টেলিফোনে শেষবারের মতো কথা বলা থেকে যবনিকা পতন পর্যন্ত (পৃ. ৫৭ থেকে পৃ. ৬৪) ।

—এই নাটকে মনোজগতের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যে সুরজিতের মানস-বিবর্তন হয়েছে ব্যঞ্জনাময়তায় সমগ্রতাসন্ধানী। এই পরীক্ষা নুরুল মোমেনের সচেতন শিল্পদৃষ্টি-সম্ভূত এবং তা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। কাহিনী অপেক্ষা ভাবনা-বিপর্যয়, ঘটনা অপেক্ষা অতীত ঘটনার কুশলী উপস্থাপনা এবং প্রত্যক্ষ সংঘাত অপেক্ষা সুরজিতরে যন্ত্রণাময় রক্তিম মানস-দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছে 'নেমেসিস' এর নাটকীয় অগ্রগতি।

ধ্রুপদী ট্র্যাজেডি নাটকের ত্রিমাত্রিক ঐক্যের সঙ্গে নতুনতর এক ঐক্যসূত্র সংযোজন, আলোচ্য নাটকে, নুরুল মোমেনের শৈলীনির্মাণে পরীক্ষা-প্রবণতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সময়, স্থান এবং ক্রিয়া—এই ঐক্যত্রয়ের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে নতুন ঐক্য—চরিত্রের একত্ব বা unity of person এই পরীক্ষায় নাট্যকার ছিলেন সচেতন; তাই 'পূর্বাভাষ'-এ তিনি বলেছেন, "এই নাটকটিতে গ্রীক ট্র্যাজেডির চিরাচরিত সময়,

স্থান ও ক্রিয়া—এই ঐক্যত্রয়ের আঙ্গিক ঠিক রেখে চতুর্থ ঐক্য অর্থাৎ চরিত্রের একত্ব (unity of person) সংযোগ করে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে।"[১০]

একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি নাটক নির্মাণে নুরুল মোমেনের এই পরীক্ষা দুঃসাহসী, সন্দেহ নেই। নুরুল মোমেনের পূর্বে পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এক-চরিত্র নাটক রচনা করেছেন। এই এক-চরিত্র নাটকগুলো হচ্ছে অগাস্ট স্ট্রিন্ডবার্গ-এর (১৮৪৯-১৯১২) 'দি স্টংগার', ইউজিন ও নীল-এর 'দি 'ব্রেকফাস্ট', জাঁ ককতু-র, 'দি হিউম্যান ভয়েস', এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিনি পয়সায় ভোজ'। কিন্তু উপর্যুক্ত চারটি নাটকের কোনটিকেই, যথার্থ অর্থে, পূর্ণাঙ্গ নাটক বলা যায় না। চারজন নাট্যকারের পরীক্ষাই সংক্ষিপ্ত নাটক রচনার প্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' এর মতো উল্লিখিত নাটক চতুষ্টয় বিষয়বস্তুর বিশ্বজনীনতায় ঋদ্ধ নয়। এই দ্বিবিধ কারণে, তাঁদের চেয়ে নুরুল মোমেনের পরীক্ষা ছিল অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ; এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি শিখরবিন্দুস্পর্শী। উপর্যুক্ত নাটক চতুষ্টয় নুরুল মোমেনের অন্তর্প্রেরণার উৎস; কিন্তু সিদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে 'নেমেসিস' স্বয়ংস্বতন্ত্র এবং বিশিষ্টতায় সূর্যপ্রত্যাশী। অন্তর্প্রেরণার কথা নাট্যকার পরোক্ষ স্বীকার করেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি আপন প্রাতিস্বিকতা প্রকাশেও সুমিত এবং সুদৃঢ়। এ-প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য: "ককতুর নাটকটি ছাড়া উপরোক্ত নাটিকা-গুলি (দি স্টংগার, দি ব্রেক ফাস্ট, বিনি পয়সার ভোজ) সবই প্রায়া পনের-কুড়ি মিনিটের। ককতুর নাটকটি (দি হিউম্যান ভয়েস) অক্ষেপা-কৃত দীর্ঘ। তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে যা বোঝায় এটা তা কিনা সেটা বিবেচনা সাপেক্ষ। ... সুতরাং পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে এ-নাটকটি কতদূর সার্থক-সৃষ্টি হয়েছে তার বিচার উক্ত নাটকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শুধু সঠিকভাবে হতে পারে।"[১১]

এক-চরিত্র নাটকে কাহিনীর অগ্রগতি এবং নাট্যিক সংঘাত বিনির্মাণ স্রষ্টার কাছে এক কঠিন পরীক্ষা। কারণ চরিত্রের একত্বের কারণে কাহিনীর অগ্রগতি হয়ে পড়তে পারে শ্লথগতিসম্পন্ন, সংলাপের দীর্ঘতায় সৃষ্টি হতে পারে একঘেয়েমি, কিংবা ঘটনাংশ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে সংঘাতহীনতায়। কিন্তু আলোচ্য নাটকে নুরুল মোমেন

অবিশ্বাস্য সাফল্যে এই সমুদয় সম্ভাবনাকে অতিক্রম করেছেন ; কাহিনী প্রথমাবধিই ছিল গতিচঞ্চল, সংলাপ সুমিত আর ঘটনাংশ সুরজিতের মানসদ্বন্দ্বে আদি-অন্ত তরঙ্গিত। মঞ্চে কখনো টেলিফোন সেট ব্যবহার করে ; কখনো পত্র-পাঠ কিংবা জানালায় দাঁড়িয়ে এমন ভাবে অন্যের সঙ্গে কথা বলা, যার কথা দর্শক শুনছে না কিন্তু সুরজিত বুঝতে পারছে ; কখনো-বা সুরজিতের বিবেকের সঙ্গে মানুষ সুরজিতের কথা বলিয়ে চরিত্রের অভাবকে পূরণ করেছেন নাট্যকার। এই কৌশল কখনোই শৈল্পিক সুষমা হারায়নি, সৃষ্টি করেনি বিরক্তি; বরং কঠিন পরীক্ষায় একজন নাট্যকার অর্জন করেছেন আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য। উদাহরণ হিসেবে 'নেমেসিস' থেকে উদ্ধৃত করছি একটা এলাকা :

সোসিয়ালিস্ট পার্টি অফিস? অমলবাবু আছেন—আপনাদের কর্ম্মকর্তা ?

[কি একটা উত্তর এল। সুরজিত বললো]

আছেন। তাকে বলুন, আমি সুরাজিত নন্দী, তাকে ডাকছি—

[অমলবাবু ঘরে ছিলেননা বোধ হয়। ও প্রান্তের উত্তর শুনে তাই সুরজিত বললো]

বেশ আমি ধরে থাকি আপনি তাকে খবর দিন—

[অমলবাবুর প্রতিক্ষায় কিছু সময় কাটল। সুরজিত বক্তৃ-তাটার উপর হাত বুলালো। পরে হঠাৎ বললো]

অমলবাবু ? আমি নন্দী। আপনাদের সভায় দেয়ার জন্যে যেবক্তৃ-তাটা লেখা হয়েছে তার মোহড়া দিচ্ছিলাম। বেশ কড়া হয়ে যাচ্ছে যেন। শুনবেন একটু ? শুনুন। "নেমেসিস, প্রতিহিংসার দেবী একবার ফিরে চাইবে না ? হ্যাঁ চাইবে। যারা হকদারকে অন্ন দেয়নি, ভগবানের অবাধ দানকে যারা বেঁধে ফেঁপে উঠেছে, তারা ধরাশায়ী হবে—" এটা বাদ দিতে চাই।

[অমলবাবু রাজী নন বোঝা গেল। সুরজিত তার প্রতিধ্বনি করে বললো]

ওঃ, বাদ দেয়া ঠিক হবেনা ; উদ্দীপ্ত হবে না লোকে? আচ্ছা বেশ। তবু একবার বিবেচনা করে দেখবেন।

[রিসিভার রাখলো। কাগজখানা টেবিলে রেখে চেয়ারটায় পূর্ণ ঠেস দিয়ে বসে বললো]

ইস্ কি অভিশাপ! মনটা চমকে ওঠে। অথচ না বললে নয়—হিরো হওয়ার দক্ষিণা!

[টেলিফোঁ বেজে উঠল: ক্রীং-ক্রীং-ক্রীং। রিসিভার তুলে নিয়ে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলো সুরজিত]

তাহলে মত পরিবর্ত্তন করেছেন অমলবাবু? ওটুকু না বললে চলবে?

[অমলবাবু ফোন করে নাই বুঝলো। বললো]

ওঃ আপনি অমলবাবু নন। কে আপনি?

[ওধার থেকে পরিচয় এল। সুরজিত জিজ্ঞাসা করলো]

অসীম? কোন্ অসীম? ওঃ আমার ম্যানেজার? তুমি কোত্থেকে বলছো?[১২]

সুরজিত নন্দী সমাজ ও সময়বিচ্ছিন্ন বলে অর্ন্তস্বভাবে নিষ্ক্রিয়, আত্ম-উন্মোচন এবং স্বীকারোক্তিতে বাক্-সর্বস্ব, আত্মবিরোধ ও মানসদ্বন্দ্ব প্রকাশে আবেগশাসিত এবং অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। এ-ধরনের চরিত্রকেন্দ্রিক নাটকে নাট্যিক অগ্রগতি নির্মাণে নাট্যকারকে সংলাপ এবং বাক্‌কৌশলের ওপর নির্ভর করতে হয়। নাটকীয় সংলাপে অভিযোজন শক্তি ও সংশ্লেষণ গুণ এবং নাট্যিক সুমিতি ও মননশীলতা সৃষ্টি করে নাট্যকার কাহিনীর আভ্যন্তর সংকট-অগ্রগতি এবং ট্র্যাজিক পরিণতিকে রূপময় করে তুলেছেন। আপাত নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নুরুল মোমেন, সংলাপের সাহায্যে আনতে চেয়েছেন সক্রিয়তা। এই নিরীক্ষায় নুরুল মোমেনের সাফল্য, বাংলা নাটকের পটভূমিতে, বিস্ময়কর এবং অনতিক্রান্ত। সময় এবং প্রতিবেশের কারণে ফস্টাসের মতো, নিমচাঁদের মতো, সুরজিত নন্দীর জীবন-পরাভবকে নাটকীয় অবয়ব দেয়ার জন্য নাট্যকারকে প্রধানত সংলাপের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই আত্ম-উন্মোচনকারী সুরজিতের জীবনমূল-উৎসারিত সংলাপ নিজগুণেই হয়েছে সকর্মক। সুরজিতের যন্ত্রণাময় আবেগ, তার দুঃসহ একাকিত্ব, আত্যন্তিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, আভ্যন্তর অগ্ন্যুৎপাত সৃষ্টিতে নুরুল মোমেন ক্রিস্টোফার মার্লো দ্বারা প্রাণিত হয়েছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। দেখা যাক, সংলাপে চরিত্রদ্বয়ের আবেগগত সাদৃশ্য:

ক. সুরজিত নন্দী

নাও, দেবী, এবার সই হয়ে গেল। নেমেসিস, তোমার উপর এক হিসেবে আমি টেক্কা দিলাম।...এইতো জীবন?

প্রাক্তন স্কুল মাস্টার, বর্তমান লক্ষপতি, আগত কালের দানবীর! এর কিছুই সে হতে চায়নি, অথচ—ভাগ্যচক্রের বিবর্তন-মাঝে অসহায় মানব-সন্তান!...কিন্তু ভগবান, তুমি আমার আছ। আমি ত তোমারই সৃষ্ট জীব—আমার উপর করুণা কর। আমার মনের কাঁটা ঘুরিয়ে দাও, তোমার স্বস্তির বাণী আমাতে এসে পৌঁছুক। মরবার এই মুহূর্ত্তে আলো দাও, শান্তি দাও, সান্ত্বনা দাও প্রভু।[১৩]

খ. ডক্টর ফস্টাস

Ah, half the hour is past ;
'Twill all be past anon.
O God,
If thou with not have mercy on my soul,
yet for christ's sake whose blood hath ransomed me
Impose some end to my incessant pain :
Let Faustus live in hell a thousand-years
A hundred thousand, and at last be saved ![১৪]

কেবল সুরজিত নন্দীর সংলাপে নয়, স্নেহলতার পত্রেও আছে নুরুল মোমেনের এই সতর্ক, মননশীল এবং প্রাতিস্বিক কথা-বুননের স্বাক্ষর :

হঠাৎ ইনটেলেক্‌টটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, ঐ সমাজটাকে পায়ে দলার জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটা ফিনানসিয়ার-এর সাহায্যে মক্ষীরাণী নাম দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সমাজটার বুকে। চলল একটানা বিজয় অভিযান। দুমাসের মধ্যে সমাজের দুটো রাজপুত্রের হাতে আঁচা তুলে দিয়েছি। মরচে পড়া বিবেকের তাড়নায়, মা এ সব বন্ধ করে কোন একটা কারবার করতে বলেন। আমি শিউরে উঠে ভাবি : এখনকার ব্যবসা সবই ক্লেদাক্ত পাপে ভরা ; আমারটাই শুধু সৎ —the only honest living.[১৫]

যন্ত্রণার সাগর মন্থন শেষে উঠে-আসা বিংশ শতাব্দীর নবীন নীলকণ্ঠ সুরজিত নন্দী আত্মখনন, আত্মহনন, আত্ম-উন্মোচন এবং

স্বীকারোক্তির স্বাতন্ত্র্যে বাংলা নাটকের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। অস্তিত্ব-সন্ধানী এবং চেতনতল-উদ্ভাসী এই নাটক বাংলা নাটকের সংগঠন-বিন্যাসে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা, সৃষ্টি করেছে সুদূরসঞ্চারী প্রভাব। কেবল বিষয়-ভাবনার বিশ্বজনীনতায় নয়, নতুন সংগঠন-প্রকৌশলের স্বাতন্ত্র্যেও 'নেমেসিস' বিশ্বনাট্যাঙ্গনের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি, বাংলা নাটকের অবিস্মরণীয় অহংকার।

৩

বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে যাঁরা বিষয় ও প্রকরণে নবতরঙ্গ নির্মাণ করেছেন, সাঈদ আহমদ তাঁদের অন্যতম। অপেক্ষাকৃত কম পঠিত-মঞ্চায়িত এবং তার চেয়েও কম আলোচিত হলেও, তাঁর নাটক চতুষ্টয়[১৬] বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। বিষয় নয়, বরং বিষয়-উপস্থাপনার নিরীক্ষায় তাঁর নাটক বিশিষ্ট। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে-যাওয়া যে-ক'জন নাট্যকার আমাদের আছেন, সাঈদ আহমদ তাঁদের একজন। তাঁর নাটক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বিদেশে মঞ্চায়িত হয়েছে, দূর দেশ থেকে নিয়ে এসেছে এই স্বীকৃতি :

> Bangladeshi play-writer and critic Sayeed Ahmed is a picture of urbanity. ...In his four plays, which have revolutionsed theatre in the sub-continent, the philosophy is very firmly based in the mysticism, and the traditions of his Bengali heritage. ...One of them, 'Survival' is based on a traditional fairy tale and is presented is masked folk-form.[১৭]

'মাইলপোস্ট' এবং 'তৃষ্ণায়' নাটকে সাঈদ আহমদ রূপক অভি-ব্যঞ্জনায় জীবনের আশাবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'মাইলপোস্ট'-এ পরিচিত বাস্তবতার পরিবর্তে জীবনের ক্লান্তি-নৈরাজ্য-শূন্যতা-অস্থিরতা রূপময় হয়ে উঠেছে এ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিকে, আর 'তৃষ্ণায়' নাটকে প্রচলিত লোককাহিনীতে সংরক্ত সমকালের স্পর্শ মিলিয়ে নাট্যকার এনেছেন নতুন মাত্রা। তবে গঠনশৈলীগত দৃষ্টিকোণে তাঁর প্রথম নাটক 'কালবেলা' অনন্য এবং বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের

আঙ্গিক ব্যবহারের প্রথম প্রয়াস। সে-সূত্রে 'কালবেলা' আমাদের নাট্য-সাহিত্যের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য এবং আঙ্গিকের অভিনবত্ব সত্ত্বেও, সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' পূর্বসূরি সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। 'কালবেলা'-র ব্যতিক্রমী সংগঠনশৈলী বিশ্লেষণে পূর্বসূরির তিনটি প্রয়াস আমাদের চোখে পড়েছে :

ক. বজলুল করিম

> জেমস জয়েস-এর উত্তরসূরী স্যামুয়েল বেকেট-এর কৌশল ও বিন্যাসগত দিক এবং সংলাপ রীতির যেটুকু প্রভাব এই নাটকে (কালবেলা) আছে, সেটা অধিবাস্তববাদী নাটকে সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতি। সেখানে এক চরিত্রের মন্তব্য অনেক সময়ে আরেকের উত্তর কিংবা ভাবনাকে অনুসরণ করে। দুই মন, দুই ভাবনা কিংবা বহু ভাবনা, কখনো মিলে গিয়ে, কখনো বা খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একই কক্ষ-পথে ঘোরে ফেরে। উত্তরকে সযত্নে এড়িয়ে, আবেগময় প্রকাশে এবং কথার নানান রং-এ, ঢং-এ, হাল্‌কামিতে, আত্মপরিহাসযুক্ত পণ্ডিতী কেতায়, সচেতন ভাববাদিতায় অনুক্ত অনেক আধো জিজ্ঞাসার জাল বুনে যাওয়া হয়। চেতনা আর বোধ যেন ঘটনা এবং আবেষ্টনী ও সময়ের গণ্ডী থেকে হঠাৎ ছাড়া পেয়ে খেলা করে যায় ...কতগুলো মানুষের মাধ্যমে।[১৮]

খ. কবীর চৌধুরী

> এই নাটকে (কালবেলা) বস্তুতঃপক্ষে কোন কাহিনী বা ঘটনা নেই। বাস্তববাদী নাটকের প্রকরণকে বর্জন করে নাট্যকার এখানে পাশ্চাত্যের এ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিকে ঘটনাবিহীন, অসংলগ্ন সংলাপনির্ভর, অস্তিত্ববাদী দর্শনাশ্রয়ী এমন একটি নতুন ধরনের নাটক বাঙালী দর্শক-পাঠককে উপহার দিলেন যা অনিবার্যভাবে স্যামুয়েল বেকেটের নাটক, বিশেষ ভাবে তাঁর 'ওয়েটিং ফর গোডো'-র কথা মনে করিয়ে দেয়।[১৯]

গ. আতাউস সামাদ

> অত্যন্ত সাদামাটা...কথা দুই অঙ্কের একটি নাটকের পরিসরে বলা হয়তো কঠিন নয় কিন্তু যা কঠিন তা হচ্ছে কথাগুলো নাটকীয় ভাবে বলা, যাতে দর্শক শুধু তত্ত্বকথা শোনার বিরক্তি অনুভব না করে। তার চেয়েও কঠিন কাজ শেষ কথাটি জানার জন্য সারাক্ষণ দর্শকদের মধ্যে একটি উৎকণ্ঠ আগ্রহ সৃষ্টি করে রাখা। আলোচ্য নাটকটিতে 'কালবেলা' এই শেষ কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় একটি রূপক কাহিনীর মাধ্যমে মূল বক্তব্য উপস্থাপনার অনুষঙ্গে মানব-চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।[২০]

১৯৬১ সালে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিতে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটক। নাটকের এই বিষয় আমাদের কাছে অভিনব নয়, বরং অভিনব হচ্ছে এর উপস্থাপনা-কৌশল এবং সংগঠনশৈলী। এই নাটকে ঘনঘটা-পূর্ণ কোন ঘটনা নেই, নেই চরিত্রবিশ্লেষণ আর পঞ্চাঙ্করীতিতে ঘটনা-বিন্যাসের প্রথাশ্রয়ী প্রয়াস। বাস্তববাদী নাট্য সংগঠনের পরিবর্তে নাট্যকার এখানে সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন পাশ্চাত্যের এ্যাবসার্ড নাটকের প্রকৌশল। স্বপ্ন-ব্যাকরণময় কাহিনী-বিন্যাস, আপাত অসংলগ্ন সংলাপ, অর্থহীন প্রতীক্ষা---'কালবেলা' নাটকের এ্যাবসার্ড ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে জীবনের শূন্যতা, একাকিত্ব, আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, ঈশ্বর-বিচ্ছিন্নতা, নৈঃসঙ্গ্য, অন্তহীন ক্লান্তি, অর্থহীন ভবিষ্যৎ এবং অস্তিত্বের দুর্ভর যন্ত্রণা উপস্থাপনে একদল নাট্যকার সচেতনভাবে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে নাটক নির্মাণ করেন। এই নাটকে চরিত্র-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা কিংবা ঘটনাংশের ক্রমবিকাশ থাকেনা ; বরং তার জায়গায় পাই কাব্যময়তা আর প্রতীকী ব্যঞ্জনাময় পরিণাম-চিত্র। প্রচলিত নাটকের মতো দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, চরিত্রের টানাপোড়েন ও ক্রমবিকাশ, নাটকীয় বাঁক-পরিবর্তন এবং সংলাপের সঙ্গতি থাকেনা এ্যাবসার্ড নাটকে। বস্তুতপক্ষে এ্যাবসার্ড নাটকে কোন কাহিনী থাকেনা; এ-নাটকে কাহিনী যেখানে শুরু, শেষও হয় সেখানে। এ্যাবসার্ড নাটকের জনকেরা স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬–), আর্থার এ্যাজমোভ (১৯০৮–),

জাঁ জেনো (১৯১০–), ইউজীন ইয়োনেস্কো (১৯১২–), কিংবা এডওয়ার্ড এ্যালবী (১৯২৮–) চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থ-সামাজিক কাঠামো-উদ্ভূত মানব-জীবনের আতঙ্ক-নৈরাশ্য-শূন্যতা, যন্ত্রণা-বিচ্ছিন্নতা-ভবিষ্যৎ-অর্থহীনতা এবং অসীম উদ্বেগকে সাহিত্যে তুলে আনতে; ব্যাকরণহীন আপাত অসংলগ্ন সংলাপের মাধ্যমে জীবনের নতুনতর অর্থ আবিষ্কারে তাঁরা ছিলেন উন্মুখ। এ্যাবসার্ড নাটকের পথিকৃৎ-ব্যাখ্যাতা Martin Esslin-এর বক্তব্য এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাক:

> The Theatre of the Absurd speaks to a deeper level of the audience's mind. It activates psychological forces, releases and liberates hidden fears and repressed aggressions, and, above all, by confronting the audience with a picture of disintegration, its sets in motion and active process of integrative forces in the mind of each individual spectator.[২১]

—এই ব্যাখ্যার পর, বোধ করি একথা সুস্পষ্ট, এ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে সমালোচকের এই মন্তব্য যথার্থ নয়—"উদ্ভট নাটক উদ্ভট হইলেও ইহা যে নাটক নহে, ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্যবাদের অভিব্যক্তি মাত্র, এই বিষয়ে সংশয় নাই।"[২২] বরং আমরা গ্রহণ করবো এই মন্তব্য—"এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষ্য দর্শক-পাঠকের মনের গভীরতম স্তরে গিয়ে আঘাত হানা, তার চিত্তে যে-আতঙ্ক, যে-নৈরাশ্য, যে-শূন্যতাবোধ, যে-অবদমিত ভালোবাসা-ঈর্ষা-ঘৃণা-লোভ-আশা-আকাঙ্ক্ষা-লালসা-উদ্বেগ লুকিয়ে আছে তাকে তুলে আনা, মুক্ত করা, চারপাশের ক্ষয়িষ্ণুতার মুখোমুখি তাকে দাঁড় করিয়ে, চূড়ান্ত বাস্তবতার সত্যকে উপলব্ধি করার পর, প্রত্যেক দর্শক-পাঠককে তার নিজের মতো করে নতুন সংহতি গড়ার প্রেরণা যোগানো।"[২৩]

এ্যাবসার্ড নাটকে স্বাভাবিক নাট্যিক গতি থাকেনা, চরিত্রবিকাশের প্রচেষ্টা থাকে না, থাকে শুধু অনন্ত ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার জন্য অর্থহীন প্রতীক্ষার প্রহর গোণা। দর্শক জানে না ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে—ঘটতে পারে যে-কোন কিছু এবং সেই অজানা ভবিষ্যতের

দোলায় শঙ্কিত থাকে তারা, অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে হয় তারা উন্মুখ। আর একবার সাহায্য নেয়া যাক Martin Esslin-এর :

> In the Theatre of the Absurd, the audience is confronted with actions that lack apparent motivation, characters that are in constant flux, and often happenings that are clearly outside the realm of rational experience. Here, too, the audienee can ask, 'what is going to happen next?' But then *anything* may happen next, so that the answer to this question cannot be worked out according to the rules of ordinary probability based on motives and characterizations that will remain constant throughout the play. The relevant question here is not so much what is going to happen next but what is happening?[২৪]

এ্যাবসার্ড নাটকের এই সংক্ষিপ্ত স্বরূপধর্ম ব্যাখ্যার পর আমরা দেখবো 'কালবেলা'র রূপ-প্রকৌশল। ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসের অস্তিত্ব-সংহারক পটভূমিতে দ্বীপবাসী কতিপয় মানুষের চেতনতলের অপ্রকাশ্য জগতের বিহ্বল প্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। আসন্ন বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দ্বীপবাসী মানুষেরা স্মরণ করে তাদের গৌরবময় অতীত; অপেক্ষা করতে থাকে তারা সমূহ প্রলয়ের। অন্তিমে গোর্কির তাণ্ডবে ভেসে যায় দ্বীপ, শূন্যতায় হারিয়ে যায় মানুষ আর প্রকৃতি। তবু যেহেতু এ্যাবসার্ড নাটক কোনসূত্রেই নয় নেতিবাচক কিংবা নৈরাশ্যবাদী, বরং তা 'more than a mere intellectual exercise; it has a therapeutic effect'—তাই এখানে দেখি 'নিশ্চিহ্ন মানুষ-দ্বীপ, সব-কিছু···চেতনার যে রেশ রেখে যায়, তার মাঝে ভেসে বেড়ায় আদি বিস্ময়মাখা নানা টুকরো গীতিময় ছবি, আপাতবিচ্ছিন্ন কথার উর্ণজালে জীবনের সুন্দর গৌরবময় প্রতিচ্ছায়া, ব্যাপ্ত করে বোধের দিগন্তকে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায় ভ্রূপেক্ষহীনভাবে জীবনকালের কথায় আর কেলিতে সময় কাটিয়ে দিয়ে তারা মরণেরই মৃত্যু ঘটায়।'[২৫] আসন্ন বিপর্যয় জেনেও চর আলেকজান্ডারের মানুষগুলোর আপাত সংগতিহীন উচ্চারণে উঠে এসেছে মৃত্যুকে উপেক্ষা করার অন্তরময় আকৃতি :

লোকটা　বিপদ আর নেই কোনো। আছে শুধু শিষদার বংশীধারী।

মোড়ল　সে নাচবে শুধু তোমার বাঁশীতেই। বাজাও, বাজাও কলিজার টুকরোগুলো যতক্ষণ না ছিদ্র দিয়ে গলে গলে বেরিয়ে আসে। মোচড়ানো সুরের বেড়ী উদ্গত হয়ে তার দেহকে অজগরের মতো জাপটে ধরুক, পেষণ করুক।

লোকটা　আমার বাঁশীতো আমি ফেলে দিয়েছি। (সবাই আহত বোধ করে)

দাগী　এমন কাজটা তুমি করলেই বা কেন ?

লোকটা　বাচ্চাদের বাজিয়ে শোনাবার জন্যে ওরা আমাকে ডেকে-ছিলো কোথাও। আমার সুরের বর্ণালী প্রকাশের জন্য সাতটা কি আটটা ছিদ্রই যথেষ্ট ছিলোনা। সেই জন্য অনেকগুলো ছিদ্র করেছিলাম আমি। তারপর সুর নয়, শুধুই হাওয়া।···

পুরোহিত　শিষ বাজাতে তো পারো। তোমার জিভটাতো রয়েছে।

দাগী　নাও, নাও শিষ বাজাও। ত্বরা করো।

লোকটা　(সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করে।···) আমার জিভের উপর দিয়ে হাওয়ারা সব নেচে চলেছে। তাদের সামলাতে আর পারছিনা আমি।

পুরোহিত　করি কি আমরা?

মোড়ল　শ্বাস রুদ্ধ করো। সোজা হয়ে দাঁড়াও, শুধু কথা বলে যাও। সময় কেটে যাবে।···এসো শুরু করা যাক। শীগগীর। (নড়ে না)

লোকটা　আমি শুরু করি, শীগগীর।

মেয়েটা　একটা গান গাই আমি। নাই বা রইল ঢোলক, নাই বা রইল বাঁশী।[২৬]

সংলাপরীতিতে 'কালবেলা' সুস্পষ্টভাবে এ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। গঠনগত সুষমা এবং কাঠামোর ভারসাম্যের মতো এ-নাটকে ভাষা-ব্যবহার এবং সংলাপ-নির্মাণেও সাঈদ আহমদ সচেতন শিল্পদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বল্পতা, হ্রস্বতা, সঙ্গতিহীনতা আর চেতনাপ্রবাহ-রীতিতে বিষয় থেকে অকারণে বিষয়ান্তরে যাওয়া। সিমেট্রিকাল স্ট্রাকচার নির্মাণের জন্য এ্যাবসার্ড নাট্যকার সচেতনভাবে ভাষাশৈলী এবং সংলাপ-বিন্যাসের ওপর জোর দেন। ভবিষ্যৎ যে অর্থহীন আর অনিশ্চিত তা জেনেও পুরোহিত-দাগী-মোড়ল-চুলী-লোকটা-মেয়েটা—সবাই বেকেটের ভ্লাডিমির আর এস্ট্রাগনের মতো অনন্ত প্রতীক্ষায় বসে থাকে কথার আপাতবিচ্ছিন্ন অথচ অলক্ষ্য বাঁধনে। এই সূত্রে *Waiting for Godot*-এর সঙ্গে 'কালবেলা'-র সংলাপের অন্তর্স্রোতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়:

ক. *Waiting for Godot*

এস্ট্রাগন তুমি বলছ কাল আবার এখানে ফিরে আসতে হবে?
ভ্লাডিমির হ্যাঁ।
এস্ট্রাগন তখন একটা ভালো দড়ি নিয়ে আসা যাবে।
ভ্লাডিমির হ্যাঁ।
[নীরবতা]
এস্ট্রাগন ডিডি।
ভ্লাডিমির হুঁ।
এস্ট্রাগন আর আমি পারছি না।
ভ্লাডিমির তুমি ভাবছো তাই।
এস্ট্রাগন যদি আলাদা হয়ে যাই আমরা? তাহলে বোধ হয় আমাদের দুজনের পক্ষেই ভালো হত।
ভ্লাডিমির কাল আমরা গলায় ফাঁস দেবো। [একটুক্ষণ চুপ করে থাকে] যদি গডো না আসেন।
এস্ট্রাগন আর যদি আসেন?
ভ্লাডিমির তাহলে আমরা রক্ষা পাবো।...
এস্ট্রাগন কি? চলব এখন?
ভ্লাডিমির প্যান্টটা তোল।
এস্ট্রাগন কি?

ভ্লাডিমির　তোমার প্যান্টটা তোল।
এস্ট্রাগন　আমার প্যান্টটা খুলে ফেলতে বলছো ?
ভ্লাডিমির　তোমার প্যান্টটা তোল।
এস্ট্রাগন　[প্যান্ট যে নিচে পড়ে গেছে তা উপলব্ধি করে।]
ঠিক। [প্যান্ট তোলে]
ভ্লাডিমির　কি ? চলব এখন ?
এস্ট্রাগন　হ্যাঁ, চল যাই।
[কেউ নড়ে না][২৭]

খ. কালবেলা

লোকটা　...সবার জন্য আসবে আগামীকাল, হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন...কোন একদিন, কোন খানে কোন দ্বীপে, আর কোন শিষদার বংশীধারী...অন্য কোনখানে... সবখানে। অবধারিত সত্য এ। সবাই আমার শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম।
দাগী　তারপর বলো কি বলবে ?
পুরোহিত　তারপর...
মোড়ল　বলো...
মেয়েটি　(খিল খিল হাসি)।
পুরোহিত　...কি বলবে তারপর...
মোড়ল　...বলো...
দাগী　কি বলবে...
মোড়ল　তারপর বলো...
দাগী　বলো...কি বলবে...বলো...বলো...
[কেউ সাড়া দেয় না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ঐ কথা কয়টি বিড় বিড় করে বলতে থাকে।][২৮]

এ্যাবসার্ড নাটকে যেহেতু চিন্তার কোন ঐক্য থাকেনা, ভাবনা এগিয়ে চলে চেতনাপ্রবাহরীতিতে পারম্পর্যহীন ভাবে, তাই সংলাপ হয়ে পড়ে যৌক্তিকতাহীন এবং অসংলগ্ন। নাট্যকার তাঁর ভাবনাকে প্রকাশ করার

জন্য আশ্রয় নেন ভগ্ন এবং চূর্ণ চিত্রকল্পের। এ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ আলোচনা-সূত্রে Martin Esslin-এর মন্তব্য একবার স্মরণ করা যাক :

> As the Theatre of the Absurd is not concerned with conveying information or presenting the problems or destinies of characters that exist outside the author's inner world, as it does not expound a thesis or debate ideological propositions, it is not concerned with the representation of events, the narration of the fate or the adventures of characters, but instead with the presentation of one individual's basic situation. It is a theatre of situation as against a theatre of events in sequence, and therefore it uses a language based on patterns of concrete images rather than argument and discursive speech.[২৯]

আধুনিক চিত্রশিল্পীদের নির্মাণ-কৌশল আলোচনা-সূত্রে স্যামুয়েল বেকেটের মন্তব্যও এ্যাবসার্ড নাটকের প্রকাশরীতির মৌল-চারিত্র ব্যাখ্যা-কল্পে উদ্ধৃত করা যায়— "The expression that there is nothing to express, nothing with which to express, nothing from which to express, no power to express, no desire to express, together with the obligation to express."[৩০] এ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপরীতির এই বৈশিষ্ট্যে-ঋদ্ধ সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক স্মরণীয় সৃষ্টি।

সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকের মধ্যে স্পষ্টতই স্যামুয়েল বেকেটের *Waiting for Godot* (১৯৫৩) নাটকের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। *Waiting for Godot* নাটক, 'কালবেলা'র মতই 'শূন্যতা, নিষ্ফল প্রতীক্ষা, কথা নিয়ে খেলা, কোন রকমে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া, সীমা-হীন ক্লান্তি, ছেলেমানুষী, কৌতুকক্রিয়া এইসব নিয়ে গড়ে উঠেছে। নাটক যখন শুরু হয় তখন এস্ট্রাগন এবং ভ্লাডিমির গডোর জন্য অপেক্ষা করছে। নাটক যখন শেষ হয় তখনো তারা প্রতীক্ষারত।'[৩১]

স্যামুয়েল বেকেট, এ্যাডওয়ার্ড এ্যালবী, ইউজীন ইয়োনেস্কো প্রমুখ নাট্যকার বুর্জোয়া সমাজের মূল্যবোধহীনতা, পরম ক্রিশ্চিয়ান বিশ্বাসের বিশাল শূন্যতা, আসন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখে মানুষের আদিম বিস্ময়, যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের মনোজগতের রক্তক্ষরণ প্রকাশের অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে এ্যাবসার্ড রীতি গ্রহণ করেছিলেন। এ্যাবসার্ড ভাবনা প্রকাশের জন্যই তাঁদের নাটকে এ্যাবসার্ড রীতি 'জায়গা পেয়েছে, জায়গা জুড়ে বসেনি'। কিন্তু সাঈদ আহমদের 'কালবেলা' নাটকে বিষয়ভাবনায় এ্যাবসার্ড ধর্ম নেই, তা কেবল প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয়ত. এ্যাবসার্ড নাটকের সমাপ্তিতে জীবনের যে নতুনতর অর্থ উচ্চারিত হয় আপাত অসংলগ্নতার অন্তর্স্রোতে, 'কালবেলা' নাটকে তা অনুপস্থিত—বরং সবকিছু এখানে ভেসে যায় প্রলয়ের প্লাবনে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, 'কালবেলা'র প্রাকরণিক এ্যাবসার্ড-ধর্ম আমাদের নাট্যসাহিত্যে পাশ্চাত্য নাটকের স্বাদ এনেছে, স্বীকার করতেই হয়।

৪

আঙ্গিক-নিরীক্ষায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টি-প্রয়াসী সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান'[৩২] নাটকটি আমরা এবার পরীক্ষা করবো। সিকান্দার আবু জাফর সংরক্ত সমকাল-স্পর্শী সাহিত্যিক, কিন্তু ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময়ের পটভূমিতে, আরো অনেক শিল্পীর মতো, তিনি সমকালকে, সমকালের যুদ্ধবিরোধী মানসিকতাকে প্রকাশ করার জন্য রূপকের আশ্রয় নিলেন। যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর রূপক নাটক 'শকুন্ত উপাখ্যান'-এ প্রকাশিত হয়েছে যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য।

রূপক বা Allegory-তে আখ্যানের বর্ণনাময় সারল্যের আবরণে রূপলাভ করে গভীরতর অর্থব্যঞ্জক ভাবনা। রূপকের অর্থ দ্বিমাত্রিক—প্রথমটি স্পষ্টার্থবোধক; আর দ্বিতীয়টি আখ্যানের অন্তরালবর্তী। প্রত্যক্ষ নাট্যঘটনা আমাদের নিয়ে যায় অন্তরালবর্তী বৃহত্তর কোন অর্থের দিকে। রূপক নাটকে দুটো ভাবনাই ভিন্ন অথচ তা সমান্তরাল; তবে দর্শক-পাঠকের কাছে আখ্যানের অন্তরালবর্তী অর্থই পায় প্রাধান্য। রূপক নাটকে রূপ নয়, তত্ত্বই মুখ্য। রূপকে প্রতিটি চরিত্রই বিশেষ

ভাবধারার প্রতিনিধি। রূপক নাটকের সঙ্গে অনেকেই প্রতীকী নাটকের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন ; কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে মৌল-ব্যবধান। রূপক যেখানে দ্বিমাত্রিক অর্থবহ, প্রতীকী নাটক সেখানে বহুমাত্রিকতায় ঋদ্ধ। C. S. Lewis রূপক এবং প্রতীকের পার্থক্য করেছেন এভাবে—"Symbolism is a mode of thought, but allegory is a mode of expression."[৩৩] রূপক নাটকের স্বরূপ-সন্ধানে আমরা সাহায্য নিচ্ছি পাশ্চাত্য সমালোচকের—"Allegory attempts to evoke a dual interest, one in the events, characters, and setting presented, and the other in the ideas they are intented to convey or the significance they bear. The characters, events, and setting may be historical, fictitious, or fabulous ; the test is that these materials be so employed in a logical organization or pattern that they represent meanings independent of the action deseribed in the surface story."[৩৪]

সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকের রূপক অর্থ সুস্পষ্ট। নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকার ঘোষণা করেছেন রূপকার্থ-সন্ধানের সূত্র—"স্মরণাতীত কালের কাহিনী। ধরে নেওয়া যাচ্ছে যে, জীব-জন্তু, পশু-পাখী তখন কথা বলতে পারত। চিন্তায়, জ্ঞানে, বিচার-বুদ্ধিতে তারা ছিল আজকের মানুষের মতই উন্নত। তাদের নানা দেশ ছিল, শাসক ছিল, শাসন পদ্ধতি ছিল, মন্ত্রী ছিল, উপদেষ্টা ছিল, আর ছিল বীরত্ব এবং দেশপ্রেম। সে-যুগেও কোনো না কোনো কারণে যে-কোনো দুই দেশের ভিতরে লড়াই বেঁধে যেত। আমাদের এ নাটক ময়ূর ও রাজহংসের অধিকারভুক্ত দু'টি স্বতন্ত্র দেশের মর্মান্তিক যুদ্ধ কাহিনী।"[৩৫]

এই নাটকে পাত্র-পাত্রী কেউই মানুষ নয়, তারা বিভিন্ন জাতের কতিপয় পাখি। স্বপ্নগ্রামের সম্রাট মণিপুচ্ছ ক্ষমতার দম্ভে আক্রমণ করেছে হংসগর্বের রাজ্য কল্পগ্রাম। ভয়াবহ যুদ্ধের পর নতুন যুদ্ধের আশঙ্কায় মণিপুচ্ছের মধ্যে এই বোধ জন্ম নেয় যে, যুদ্ধ কারো জন্যই মঙ্গলজনক নয় ; সুতরাং তিনি প্রধানমন্ত্রী দিকচক্ষুর মাধ্যমে শান্তির সন্ধি পাঠান। নাটকের অন্তিমে দিকচক্ষু এবং হংসগর্বের সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এই রূপক-নাট্যের অন্তরালবর্তী দ্বিতীয় অর্থ :

হংসগর্ব আপনার মতে কোন্ প্রকার সন্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ ?

দিকচক্ষু　জাঁহাপনার আপত্তি না থাকলে স্বপ্নগ্রামের পক্ষ থেকে কল্পগ্রামের সঙ্গে আমি 'সুবর্ণ-সন্ধি'-র প্রস্তাব দেবো।...

হংসগর্ব　সুবর্ণ সন্ধি ?

দিকচক্ষু　হ্যাঁ সম্রাট।

হংসগর্ব　এ সন্ধির শর্ত?

দিকচক্ষু　সত্যের প্রতিজ্ঞায় এর শুরু, সখ্যতার বন্ধনে এর শেষ। একে বলব 'মৈত্রীর সন্ধি'। (জনতার কোলাহল—শ্রেষ্ঠ সন্ধি। সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ধি। জয় মহামন্ত্রী দিকচক্ষুর জয়, জয় স্বপ্নগ্রামের জয়, জয় কল্পগ্রামের জয়)

হংসগর্ব　(উল্লসিত আগ্রহে দিকচক্ষুর কাছে এগিয়ে এসে) ধন্য, ধন্য মহামন্ত্রী। স্বপ্নগ্রামের আলিঙ্গন গ্রহণ করুন। (দিকচক্ষুর আলিঙ্গন দান) মহত্বের অধিকার, হৃদয়ের অধিকার, জীবনের অধিকার যে সন্ধির শর্ত তাই স্বাক্ষরিত হোক, শুধু আমাদের ভেতরেই নয়—দেশে দেশে যুগে যুগে।[৩৬]

যুদ্ধ-ক্ষমতা-লোভ-লালসা-প্রতারণা-ষড়যন্ত্র মানুষকে কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই পাখির রূপকে নাট্যকার কল্যাণ-মঙ্গল আর শান্তির কথা প্রচার করেছেন এ-নাটকে।

রূপক নাটকে মঞ্চসজ্জায় তেমন বিশিষ্টতা থাকেনা, তবে সংলাপে, অন্তরালবর্তী অর্থের কারণে, থাকে দৃঢ় বাঁধুনী এবং আভিজাত্য। 'শকুন্ত উপাখ্যান'—এ রূপক-নাট্যের সংলাপের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উপরে উদ্ধৃত সংলাপের মধ্যে আমরা সংলাপের দৃঢ়-সংহতি এবং আভিজাত্যগুণ লক্ষ্য করি।

'শকুন্ত উপাখ্যান'-এর নাট্যকাহিনী রূপক হলেও, এর নামকরণে আছে প্রতীকধর্ম। একদিকে এর নামকরণ পক্ষীকুলের উপাখ্যান বলে শকুন্ত উপাখ্যান—এটা ভাবা যায়; অন্যদিকে ধূর্ত, হিংস্র, অন্যের শাবক ছোঁ-মেরে নিয়ে-যাওয়া স্বভাবসম্পন্ন শকুন পাখির প্রতীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধপ্রিয়তা, ধাতব অস্ত্রধারীর নির্বুদ্ধিতা এবং দিকচক্ষু-জ্ঞানাধিপরূপ মন্ত্রণাদাতার খেলনা-পুতুল রাজশক্তির অদূরদর্শিতা হয়তো নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু এক সময় এই শাকুনশক্তি

পরাভব মানবে; যুদ্ধের পরিবর্তে মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে মিলন-সেতু—এই সূত্রেই নাটকের নাম হয়তো 'শকুন্ত উপাখ্যান'।

'শকুন্ত উপাখ্যান' একাংকিকায়, পক্ষীকুলের রূপকে, সিকান্‌দার আবু জাফর তুলে এনেছেন মানুষের চেতনতলের 'good' এবং 'evil'-এর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে evil পরাজিত হয়েছে; যুদ্ধ আর ক্ষমতার দম্ভের পরিবর্তে ভালোবাসা আর মৈত্রী-বন্ধন বিজয়ী হয়েছে। সিকান্‌দার আবু জাফর তাঁর মূল্যবোধগত সদর্থক অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে পাখিদের রূপকে রূপময় করে তুলেছেন আলোচ্য নাটকে। বিষয়ের এই যুগ-সংলগ্নতা, প্রকাশের এই নব-নিরীক্ষা 'শকুন্ত উপাখ্যান'-এর বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্য।

৫

কথাসাহিত্যের মতো, নাটকেও, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিষয়-ভাবনা ও প্রকরণনিষ্ঠায় ব্যতিক্রমী জীবনার্থ-ঋদ্ধ, পরীক্ষা-প্রিয় এবং তপস্যাশুদ্ধ শিল্পী। 'শিল্পবোধ ও শিল্পসূত্রের প্রশ্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন পূর্বাপর সপ্রতিভ, সতর্ক ও বিশ্বপ্রসারিত। জীবন-অনুধাবন ও শিল্পপ্রকরণে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বতন্ত্র এবং ক্রমাগত সূক্ষ্মতর সৃষ্টি-সাফল্যের অভিযাত্রী।'[৩৭] বিষয়বস্তু, গঠনশৈলী এবং মঞ্চকলার নব-নিরীক্ষায় তাঁর নাটক চতুষ্টয়[৩৮] বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায় নির্মাণ করেছে বিশিষ্ট মাত্রা। 'বহিপীর' নাটকে অন্তিমের ব্যঞ্জনাময়তা এবং মঞ্চ-পরিকল্পনার উত্তীর্ণ-পরীক্ষার অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে নতুন এবং প্রাগ্রসর পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। বিষয়ভাবনা, ঘটনাংশ উপস্থাপনা, মানুষের অন্তর্বাস্তবতার প্রতীকী-প্রকাশ এবং সংলাপ-রীতির অভিনবত্বে 'তরঙ্গভঙ্গ' বাংলা নাটকের ধারায় এক সম্পূর্ণ নতুন নির্মাণ।

বিষয়ভাবনা ও প্রকাশরীতিতে বিশিষ্ট এবং প্রাগ্রসর হলেও, পূর্বসূরি সমালোচকেরা 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের মৌল-বক্তব্য এবং অবয়ব-কৌশল বিশ্লেষণে শ্রমবিমুখতার পরিচয় দিয়েছেন, কেউবা আবার এমন ধারণা ব্যক্ত করেছেন—যা নাটকের আভ্যন্তরবৈশিষ্ট্য-সমর্থিত নয়, নয় সত্য-স্পর্শী। তবে 'তরঙ্গভঙ্গ'-এর ব্যতিক্রমী-সত্তা নির্দেশে চারটি প্রয়াস এখানে উল্লেখযোগ্য :

ক. নীলিমা ইব্রাহিম

এ নাটকখানাকে (তরঙ্গভঙ্গ) ঠিক বাস্তবধর্মী নাটক না বলে সাঙ্কেতিকতাশ্রয়ী বলা যায়।... তরঙ্গভঙ্গ নাটকে ওয়ালীউল্লাহ্ 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতার রীতিকে নাটকীয় সংলাপে উপস্থাপনা করেছেন।[৩৯]

খ. সৈয়দ আলী আহসান

এটিও ('তরঙ্গভঙ্গ') আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক নাটক। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে সময়ের প্রবাহকে অপসৃয়মান না ভেবে জীবনসত্যের ভিত্তিভূমি হিসেবে নাট্যকার পরীক্ষা করেছেন।[৪০]

গ. কবীর চৌধুরী

এই নাটকে ('তরঙ্গভঙ্গ') কাহিনীর উপস্থাপনাভঙ্গী, কাহিনীর পশ্চাতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নাট্যকারের দৃষ্টিকোণ, কোরাস ও বিবেকজাতীয় চরিত্র-সৃষ্টি, সংলাপ ও প্রতীকের ব্যবহার সবই বাংলা নাট্যজগতে প্রায় সম্পূর্ণ নতুন।... সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্ 'তরঙ্গভঙ্গ' রচনা করার সময় সার্ত-কাম্যু প্রমুখের অস্তিত্ব-বাদী জীবনদর্শন ও নবনাট্যাঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ইউরোপের এ্যাবসার্ড বা কিমিতি নাটকও হয়তো তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিল।[৪১]

ঘ. বেগম আকতার কামাল

...বন্দীচেতনার অস্তিত্ব ও তার পরাজয়ই এ-নাটকের (তরঙ্গভঙ্গ) প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ সাঁত্রে-মুখী অস্তিত্ববাদকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেজন্য দেখি আত্মতদন্ত, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-বিশ্লেষণই এখানে মুখ্য, কোন রকম সক্রিয় সংঘাত বা কার্যকারণ ঋদ্ধ আচরণ নয়।...সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে inner reality—বস্তুর অন্তর্সত্তাকে আবিষ্কারে উৎসাহী। ফ্রয়েডের স্বপ্ন ও কল্পনার (dream and fantasy) ব্যাখ্যানে যে innerreality ব্যক্ত করবার প্রয়াস চলেছিল; সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

সাঁত্রে-প্রভাবিত অস্তিত্ববাদ। মোটামুটি এই হচ্ছে 'তরঙ্গভঙ্গে'র চিন্তা-প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে নাটকটিকে অভিব্যক্তি-বাদী (expressionistic) নাটক বলে আখ্যায়িত করা চলে।[৪২]

—স্পষ্টতই লক্ষণীয়, বেগম আকতার কামাল 'তরঙ্গভঙ্গের' গঠন প্রকৌশল বিশ্লেষণে অতি-সতর্ক এবং পরিশ্রমী।

'তরঙ্গভঙ্গ' স্পষ্টত অভিব্যক্তিবাদী নাটক (Expressionistic Drama)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ভগ্নপক্ষ চূর্ণস্বপ্ন জর্মান জাতির মানসিক বিপর্যয় উপস্থাপনে একদল শিল্পীর হাতে অভিবাক্তিবাদী প্রকাশরীতির সৃষ্টি। অভিব্যক্তিবাদী শিল্পকর্মে মানুষের অবচেতন অভিজ্ঞতার (inner experience) প্রতীকী এবং চিত্রকল্পময় প্রকাশ ঘটে। অভিব্যক্তিবাদীর কাছে সময় ও স্থানের কোন মূল্য নেই, তাঁর হাতে যে-কোন ঘটনা যে-কোন সময়েই ঘটতে পারে। সন্ত্রাস-আশঙ্কা-অস্তিত্ব-ভাবনা এবং মনোজাগতিক বাস্তবতা প্রকাশে বহির্জাগতিক আকারের বিকৃতি ঘটানোই অভিব্যক্তিবাদের মৌল-বৈশিষ্ট্য। Gassner-এর ভাষায় অভিব্যক্তিবাদের স্বরূপ-সত্তা—' Expressionism called for the pre-sentation of inner states rather than outer reality as weel as for the distortion of the later by the inner eye।'[৪৩]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে সচেতনভাবেই মানুষের অন্তর্বাস্তবতা উপস্থাপনে অভিব্যক্তিবাদী প্রকাশরীতি গ্রহণ করেছেন। 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে স্পষ্টতই দেখা যাবে অভিব্যক্তিবাদের এই মূল কথা—"revolt against Realism, the distortion of the objects of the outer world and the violent dislocation of time sequence and spatial logic."[৪৪]

'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে তেমন কোন কাহিনী নেই এবং এর বাইরের ঘটনা আমাদের পরিচিত। আমেনা নামের এক গ্রাম্য মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় হত্যা করেছে তার শিশু-সন্তান এবং স্বামীকে। এই হত্যা-কাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী আবদুস সাত্তার নেওলাপুরী নিজেই উদ্যোগী হয়ে আদালতে বিচার প্রার্থনা করেছে। জজ আদালতে বিচার করতে বসে-ছেন। কিন্তু বহির্বাস্তব বিচারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-চরিত্রসমূহ, বিশেষত জজসাহেব সম্মুখীন হয়েছেন মনো-বিচারালয়ের। মনোবিচারালয়ের

সামনে নাট্য-চরিত্রসমূহের বহির্জাগতিক ভাবনার বিকৃতি এবং অন্তর্বাস্তবতার অসঙ্গতিতে ক্রমে পল্লবিত হয়ে ওঠে নাটকের অগ্রযাত্রা। নাট্যকার এ-নাটকে বহির্জাগতিক ভাবনার বিকৃতি এবং অন্তর্বাস্তবতার অসঙ্গতি উপস্থাপনে একটি স্বপ্ন-দৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসের মতো, 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানুষের inner isolation বা মানস-পরিব্রাজনা নির্মাণ করেছেন। তাই আমেনার বিচারসূত্রে জজসাহেবের বিষণ্ণতা ও ব্যর্থতা, নাটকের চরিত্রপুঞ্জের বাস্তব অবয়ব এবং ঘটনাংশের জাগতিক ভিত্তি সবই চেনা-জানা জগৎ থেকে ভিন্নাত্মক; প্রচলিত অবয়বের পরিবর্তে তারা পায় নতুন রূপ-রীতি। চরিত্রের অন্তর-সত্তার এই রূপালেখ্য একবার পরীক্ষা করা যাক :

জজ।　　(মাথা নেড়ে আপন মনে) শান্তি নাই। শান্তি নাই।

আবদুস সাত্তার।　　শান্তি পাবেন, আপনার বাসনা একবার তৃপ্ত হলে শান্তি পাবেন। আপনার অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ হলো বলে। এত বেচইন হবেন না, জজসাহেব! গন্তব্যস্থলের শেষ কয়েক পদক্ষেপ অতি কষ্টকর। এ-সময়ে ধৈর্য-স্থৈর্যের বিশেষ প্রয়োজন।

জজ।　　(সংযত হয়ে শ্রান্ত কণ্ঠে নত মুখে) তবে আদালত ডাকা হোক! কোথায় আসামী, কোথায় সাক্ষি-সাবুদ?

আবদুস সাত্তার।　　(মঞ্চের পেছনে তাকিয়ে) আসামী! এসো, এগিয়ে এসো, জজ-সাহেবের হুকুম তামিল করো।...

জজ।　　(নতমুখে নীরস কণ্ঠে) কোথায় আসামী?

আবদুস সাত্তার।　　(উৎফুল্ল কণ্ঠে) চোখ তুলে দেখুন : আপনারই সমক্ষে দাঁড়িয়ে আসামী। তাকিয়ে দেখুন তার পাপজর্জর মুখমণ্ডল, তার বিবেকশূন্য নিষ্ঠুর দৃষ্টি, তার ঘৃণাস্পদ অবয়ব।...

জজ।　　অপরাধ কি আসামীর?

আবদুস সাত্তার।　　বলো আসামী তোমার অপরাধের কথা, নির্ভয়ে বলো। জজ সাহেবকে ভয় করো না। তিনি অতিশয় দয়াবান। বলো, বলো তোমার স্বামী-হত্যার কাহিনী...

জনতা। বলো আমেনা, বলো।

আবদুস সাত্তার। বলো কী করে শিলপাথরে বেটে ধুতরা-পাতার বিষাক্ত রস তৈরি করেছিলে নিজের হাতে, কী করে সে-বিষ তুলে দিয়েছিলে অসহায়, বিশ্বাসী স্বামীর মুখে, কী করে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখেছিলে তার মরণ-যন্ত্রণা।

জনতা। (উত্তেজিত ভাবে) বলো আমেনা, বলো।

জজ। (আবার কানে আঙুল দিয়ে) আদালতে কেন এত শোরগোল ! সবাই খামোশ হোন ! খামোশ ! খামোশ !

আবদুস সাত্তার। (হাত তুলে) খামোশ। সবাই খামোশ হোন। আমাদের প্রিয় বিচারকের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না।

জজ। (ভগ্ন, শ্রান্তকণ্ঠে) আমাকে একটু শান্তি দিন, একটু শান্তি দিন।[৪৫]

ব্যক্তির এই বিচূর্ণ-বিভঙ্গ রূপাঙ্কণের কারণে 'তরঙ্গভঙ্গ' যেমন পায় অভিব্যক্তিবাদী নাটকের অভিধা ; তেমনি অন্তর্চেতনার ঘূর্ণাবর্তে এক সময় স্থিত ও দায়িত্বসচেতন হয়ে-ওঠা জজসাহেবের ভূমিকা একে এনে দেয় অস্তিত্ববাদ-প্রভাবিত শিল্পের চারিত্র। জজসাহেব যখন বুঝতে পারেন, হত্যাকাণ্ডের পিছনে নেওলাপুরীর ভূমিকা আছে, তখন তিনি মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতি (border line situation) অতিক্রম করে নেওলাপুরীকে হাজতে বন্দী করেন। কিন্তু যখন জানতে পারেন নেওলাপুরী তার বিরুদ্ধে উপরে পাঠাবে অভিযোগপত্র, তখন আবার তিনি অস্তিত্বহীনতায় ভোগেন এবং একসময় তার মৃত দেহ ঝুলতে থাকে ছাদ থেকে। স্পষ্টত বোঝা যায়, 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তাফার মতো অস্তিত্ববিলুপ্তির যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছেন জজসাহেব। সমাজবিচ্ছিন্ন-সত্তাবিচ্ছিন্ন এবং দুর্ভর মানবিক দায়িত্ব-পালনে ব্যর্থ ব্যক্তিসত্তার এই পরাজয় নেওলাপুরীর সংলাপে রূপ-ময় হয়েছে—"আহা, একাকী প্রান্তর অতিক্রম করতে চেয়েছিলো, দড়ির বন্ধনে সে-যাত্রার অবসান ঘটেছে।"[৪৬] বহির্বাস্তবতার বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জজসাহেবের হার্দিক অগ্ন্যুৎপাত এবং অস্তিত্বের পরাভব অঙ্কনও ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সচেতন অভিলাষ।

কোন কোন সমালোচক 'তরঙ্গভঙ্গ'-কে এ্যাবসার্ড নাটক হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন ; বলেছেন এই কথা, 'নাটকটির মধ্যে এ্যাবসার্ড নাটকের লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। ...নাটকটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মানব-অস্তিত্বের কতিপয় মৌলিক সমস্যা সচেতনভাবে এ্যাবসার্ড আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন।'[৪৭] কিন্তু এ্যাবসার্ড নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ভাবনার অসঙ্গতি, অর্থহীন ভবিষ্যতের জন্য অনন্ত প্রতীক্ষা এবং সঙ্গতিহীন সংলাপ 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে যথার্থ অর্থে নেই। এখানে 'অবচেতনের দৃশ্যেও আছে যুক্তিবশ্যতা। কোথাও পারম্পর্যহীন, অর্থহীন সংলাপ নেই।'[৪৮] দ্বিতীয় দৃশ্যে এ্যাবসার্ড নাটকের স্পর্শ থাকলেও, তরঙ্গভঙ্গ-এর মূল-প্রেরণা এ্যাবসার্ড রীতি নয় ; বিন্যাসরীতি এবং চিন্তাস্রোতে তা যথার্থ অর্থেই অভিব্যক্তিবাদী রীতি-আশ্রয়ী নাটক।

তিনটি দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা এই নাটকের প্রথম দুটো দৃশ্যে চরিত্রসমূহের অন্তর্ময় ভাবনা মগ্নচেতনাপ্রবাহ রীতিতে প্রকাশিত হয়েছে। স্বপ্নের বাস্তবতায় গিয়ে নাট্যকার চরিত্রসমূহের অন্তর্সত্তাকে উন্মোচিত করেছেন। অভিব্যক্তিবাদীরা মানুষের মনোজগতের বিভঙ্গ-ভাবনার উন্মোচন ঘটান, স্বপ্ন সেখানে পালন করে সহায়ক ভূমিকা। এ-সূত্রেই *A Dream Play* (১৯৫৩) নাটকের ভূমিকায় August Strindberg-এর অভিমত, 'তরঙ্গভঙ্গ'-এর স্বপ্নদৃশ্য ব্যাখ্যার জন্যে সমান-প্রযোজ্য :

> The characters split, double, multiply, vanish, solidify, blur, grow clear. But one consciousness reigns above them all—that of the dreamer ; and before it, there are no secrets, no incongruities, no seruples, no laws. There is niether judgement nor exoneration, marely narration. And as the dream is for the most part painful, rarely pleasant, a note of melancholy and of pity for all living things runs all through the wobbly tale. Sleep, the liberator, often plays a dismal part ; but where the pain is at its worst, the awakening comes and reconcils the sufferer to reality, which, however distressful it may be, seems nevertheless happy in comparison with the torments of the dream.[৪৯]

—স্বপ্নদৃশ্য আলোচ্য নাটকের মৌল বাস্তবতা, শেষ দৃশ্যে বাস্তব-জগতের চিত্র থাকলেও, তা অর্ধ-বাস্তব, অর্ধ-সত্য। প্রথম দুটো দৃশ্যেই বিভিন্ন চরিত্রের মনোজাগতিক ভাবনা এবং বিভঙ্গ-সত্তা রূপলাভ করেছে, আর অভিব্যক্তিবাদীর কাছে তা-ই মৌল অন্বিষ্ট। সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্ সচেতন ছিলেন এই সৃষ্টিশৈলীতে। তাই দেখি, তৃতীয় বা শেষ দৃশ্যে মঞ্চকলা নির্মাণে, তিনি স্পষ্টত প্রথম দৃশ্যদ্বয় থেকে ভিন্নতা নির্দেশ করেছেন এভাবে :

> প্রথম অঙ্কে বিচারালয়ের দৃশ্যের অবিকল নকল। জজ, উকিল ,আসামী, পুলিশ, আবদুস সাত্তার, ভিখারাণী—প্রথম অঙ্কে যেখানে যেভাবে বসে বা দাঁড়িয়েছিলো, এ-দৃশ্যে তেমনি সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবে, শুধু চাপরাসিকে দেখা যাবে না।
>
> তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রথম অঙ্কের দৃশ্যের সঙ্গে বর্তমান দৃশ্যের একটি বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হবে। সে-তারতম্য চারিত্রিক পার্থক্য। বর্তমান দৃশ্যের জজ পদমর্যাদা-সচেতন সজ্ঞান ব্যক্তি, গুরুগম্ভীর কিন্তু সতর্ক এবং নিঃসন্দেহে বিচারালয়ের সর্বাধ্যক্ষ। এক কথায়, সত্যিকার বিচারক। মঞ্চের সকলেই তার প্রতি সমীহশীল, এবং কারো ব্যবহারে একটুও শিথিলতা নেই।[৫০]

অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উপযোগী সংলাপ নির্মাণ, এই নাটকে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আদি-অন্ত সতর্ক-সপ্রতিভ-সচেতন। যেহেতু চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার বিভঙ্গ রূপ-নির্মিতিই নাট্যকারের অন্বিষ্ট, আমেনার সামাজিক বিচার তাঁর কাছে গৌণ ঘটনা-মাত্র, তাই সংলাপের মধ্যে সচেতনভাবে তিনি চেতনতল-উদ্ভাসী টুকরো চিত্রকল্প আর চূর্ণ প্রতীক নির্মাণ করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বপ্নের জগতে কুকুরের পৌনপুনিক আর্তনাদ যেমন জজসাহেবের যন্ত্রণাময় আর্তির প্রতীক, তেমনি চশমা হয়ে ওঠে মানবিক প্রান্তিক পরিস্থিতিতে শর্তবন্দী মানুষের অস্তিত্বহীনতার প্রতীক। মতলুব আলীর স্বাধীন-নিরপেক্ষ-অস্তিত্বজিজ্ঞাসু অবচেতন সত্তা সংলাপের বিশিষ্টতায় উঠে আসে কি অনায়াসে :

মতলুবী আলী। একদিন আমি ছায়াশূন্য ছিলাম। মনে হয় বহু দিন আগে। তারপর সেই ছায়া এলো, হঠাৎ। শূন্যমাঠে ঘূর্ণি ওঠার মতো, হঠাৎ। প্রথমে আমার আশে-পাশে ঘোরে, সাহস নেই যে ঝট করে আমাকে ছোঁয়। তখন আমারও যেমন তাকে ভয়, তারও তেমনি আমাকে ভয়। তারপর এক দিন আমার হার হলো। যেদিন সে আমার ভেতরে প্রবেশ করলো, সেদিন অদ্ভুত একটা তৃপ্তিও পেলাম। কখনো-কখনো ভাবি, কে কাকে গ্রহণ করেছে? সে-বীভৎস ছায়া আমাকে গ্রহণ করেনি আমিই তাকে গ্রহণ করেছি। জজসাহেব, বগলে বিল নিয়ে যে ঘাটে-বাটে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করি, সেটা আমার বাইরের চেহারা। সেটা সমাজে বাস করার ছাড়পত্র শুধু। ভেতরে চেহারা ভিন্ন। ভেতরে আমি আর মানুষ নেই। জজসাহেব![৫১]

সংলাপে সিমেট্রির শৈল্পিক ইফেক্ট 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দৃঢ় সংহত কাঠামোতে সংলাপের ভারসাম্য:

ভিখারিণী। (কিছুক্ষণ পর) ধ্যাৎ! জ্বালিয়ে মারলে। (আলো পড়বে তার ওপর। দেখা যাবে উবু হয়ে বসে আছে।)

যুবক। কী হলো? (আলো পড়বে তার ওপর। সে দাঁড়িয়ে।)

ভিখারিণী। ভাগ্য ভালো। আমার যুবকবন্ধু সশরীরে হাজির হয়েছে। কী আবার হবে? বড় মশা গো! জ্বালিয়ে খেলো।

যুবক। মারো না কেন?

ভিখারিণী। স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে। দুঃস্বপ্নও স্বপ্ন।

যুবক। (বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে) ঘুম ছাড়া স্বপ্ন হয় না।

ভিখারিণী। তুমি আমার নিশীথ রাতের চন্দ্রমণি, কিন্তু তোমার বুদ্ধি একটু ভারি।

যুবক। (মুখ কালো করে) চপলতা করো না।

ভিখারিণী। শ্রদ্ধেয় তিরস্কার দাতা, চপলতার প্রয়োজন আছে। চপলতা হলো সুস্বপ্নের নৃত্য-ঝঙ্কার।

যুবক। তুমি বললে দুঃসপ্ন দেখছো।

ভিখারিণী। দুঃস্বপ্নের সময়ই মানুষ সুস্বপ্নের স্বপ্ন দেখে।[৫২]

ম্যাক্স রাইনহার্ডের (১৮৭৩-১৯৪৩) হাতে আধুনিক নাটকে মঞ্চ-কলায় যে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আসে, বাংলা নাটকে সেই পরীক্ষা-প্রবণতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিশিষ্ট। একটা বজরাকে দু'টুকরো করে ঘর বানিয়ে 'বহিপীর' নাটকে তিনি মঞ্চবিন্যাসে যে সাহসী পরীক্ষা করলেন, 'তরঙ্গভঙ্গে'র মঞ্চ-পরিকল্পনা তা থেকে অনেক জটিল ও প্রাগ্রসর। মানুষের বিভঙ্গ-ভাবনা উপস্থাপনে সেট-ডিজাইন এবং মঞ্চ-প্রতিবেশ, স্বপ্ন-জগৎ নির্মাণ কাহিনীর কেন্দ্রীয় গতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভারসাম্যময়। একটিমাত্র স্টেজসেটিং-এ এক্সপ্রেসনিস্টিক রীতিতে আলোর বিন্যাসে ওয়ালীউল্লাহ্ চরিত্রের বহুমাত্রিকতা এবং বিচূর্ণ-ভাবনার বৈচিত্র্য ধারণ করেছেন। মঞ্চে রহস্য এবং একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা আলোর বিন্যাসে এবং র-এর ব্যবহারে নির্মাণ করেছেন ওয়ালীউল্লাহ্ :

> মঞ্চের ডান ভাগে পাদপ্রদীপের সন্নিকটে তিন জন গ্রামবাসী পাছায় ভর দিয়ে নিশ্চল-নির্বাকভাবে বসে। তাদের দৃষ্টি অবনত, মুখ ভাবশূন্য। তবু মনে হয় তারা অপেক্ষা করছে। তাদের গা-এ তিন রঙের চাদর: লাল ,সবুজ এবং হলুদ। তাদের ওর চক্রাকারে উজ্জ্বল আলো। বাকি মঞ্চ অন্ধকারাছন্ন।
>
> মঞ্চের মধ্যভাগে আবছায়ার মধ্যে ভিখারিণীকে দেখা যাবে। সে গ্রামবাসীদের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্র প্রায় অন্ধকারের মধ্যে মিশে থাকবে।[৫৩]

বিষয়ভাবনা এবং প্রকাশরীতির প্রাতিস্বিকতায় 'তরঙ্গভঙ্গ' বাংলা নাটকের ধারায় এক নিঃসঙ্গ প্রয়াস, অনতিক্রান্ত সৃষ্টি। ব্যক্তির অব-চেতন ভাবনা-তরঙ্গের ভঙ্গুরতা--বিভঙ্গতা উপস্থাপনে এই নাটকে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, তাঁর কথাসাহিত্যের মতোই, সিদ্ধিতে শিখরবিন্দু-স্পর্শী, কলাবোধে তপস্যাশুদ্ধ, শিল্প-অভিযাত্রায় বিশ্বপ্রসারিত।

৬

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মতোই তপস্যাশুদ্ধ এবং বিশ্বমনস্ক নাট্যকার মুনীর চৌধুরী; গদ্যের মতো, নাটকেও, তার প্রতিটি সৃষ্টি প্রাতিস্কিকতা-চিহ্নিত। পাশ্চাত্য নাটক ও নাট্যকারের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় ছিল মুনীর চৌধুরীর। ফলে তাঁর নাটক মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং প্রকরণ-নিষ্ঠায় হতে পেরেছে ইউরোপ-মনস্ক। শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সত্তরের দশকের শুরু পর্যন্ত সময়সীমায় 'রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া এবং অর্থনৈতিক পুন-বিন্যাসের ফলে বাংলাদেশে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, মুনীর চৌধুরীর নাটক প্রধানত তারই প্রতিকৃতি।'[৫৪] বিষয়ের গৌরব, প্রকাশরীতির অভিনবত্ব, শৈল্পিক পরিমিতিবোধ এবং মঞ্চকলার মৌলিকতায় মুনীর চৌধুরীর 'কবর' (রচনাকাল ১৯৫৩, প্রকাশ-১৯৬৬) বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। 'কবর' নাটকে জর্মান অভি-ব্যক্তিবাদী নাটক্যারদের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আছে এ্যাবসার্ড নাটকের আবহ। সংগঠনশৈলীতে 'কবর' মুনীর চৌধুরীর বিশিষ্ট শিল্প-বোধের পরিচয়বাহী। তবু আমরা, 'কবর' নয়, এ-আলোচনায় অন্তর্গত করেছি তাঁর 'দণ্ডকারণ্য' (রচনাকাল ১৯৬৫; প্রকাশকাল ১৯৬৬) নাটকটিকে। 'কবর'-এর মতো 'দণ্ডকারণ্য'-এর সংগঠনশৈলীও বাংলা নাটকের ধারায় নতুনত্বের স্বাক্ষরবাহী।

'দণ্ডকারণ্য'-এর[৫৫] ভূমিকায় মুনীর চৌধুরী এই নাটকের মূল্যায়ন-সূত্র নির্দেশ করলেও, সমালোচক সেদিকে দৃষ্টি দেননি। দেখা যাক, 'দণ্ডকারণ্য' সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর ভাষ্য:

> যদিও 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' আমার নাটকীয় প্রয়াসের দুই বিপরীত প্রকৃতির প্রয়াস, উভয়ের মধ্যে আমার স্বভাব ও দৃষ্টির ঐক্যও বিদ্যমান। তবে, 'কবর' ক্ষোভপূর্ণ, অভিযোগাশ্রয়ী এবং রক্তাক্ত। 'দণ্ডকারণ্য' কৌতুকাবহ, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুত-রসাত্মক। 'কবরের' রচনাকাল উনিশ শ' সাতচল্লিশের সংলগ্ন পাঁচ-সাত বছর। 'দণ্ডকারণ্যে'র উনিশশ' ষাট-পঁয়ষট্টি। মূল্যায়নের প্রয়োজনে উভয় গ্রন্থ একত্রে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সুবিচার করা হবে।

এই মূল্যায়ন-সূত্র সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকলেও, 'দণ্ডকারণ্য' যথার্থ-অর্থে, বিস্তৃতভাবে, এ-পর্যন্ত মূল্যায়িত হয়নি। তবে এ-ক্ষেত্রে পূর্বসূরির চারটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন-প্রয়াস অবশ্যই উল্লেখযোগ্য:

ক. আনিসুজ্জামান

'দণ্ডকারণ্যে'র পশ্চাদভূমিতে রামায়ণ-কাহিনীর অংশ বিশেষের যে নবতর প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই, তা আমাদের আনন্দ দেয়। কিন্তু সেই অংশ এবং নাটকের পুরোভাগে বর্ণিত বর্তমান কালের কাহিনী, এই দুই মিলিয়ে সমগ্রতার একটা তৃপ্তিকর বোধ জাগায়না।[৫৭]

খ. কবীর চৌধুরী

...মুনীর চৌধুরীর 'দণ্ডকারণ্য'-তেও অসম্ভব-নাটকের প্রভাব উপস্থিত। নাটকটি নিরীক্ষাধর্মী, দ্বিমাত্রিক, সচেতনভাবে অন্তরাশ্রয়ী। নাট্যকার নিজে একে অদ্ভুতরসাত্মক বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদ্ভুত আর অসম্ভব অথবা উদ্ভটের মধ্যে ফারাক খুব বিরাট নয়।[৫৮]

গ. রফিকুল ইসলাম

দণ্ডকারণ্য নাটকের চরিত্র ও বিষয় আধুনিক, সমকালীন, নাগরিক কিন্তু এ-নাটকে তিনি 'মাইথ' বা পুরাণের কাহিনী এবং চরিত্র ব্যবহার করেছেন।...এখানে নাট্যকারের উদ্দেশ্য পুরাণের কাহিনী বর্ণনা বা চরিত্র চিত্রণ নয় বরং বর্তমানের কোন ঘটনা বা চরিত্রকে পুরাণের কোন প্রতিষ্ঠিত কাহিনী বা চরিত্রের আশ্রয়ে স্পষ্ট করে তোলা।[৫৯]

ঘ. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

'দণ্ডধর'-এ যেমন জীবন ও নাটকের একই ভূমিতে অবস্থান, 'দণ্ডকারণ্যে' তেমনি পুরাণে ও বর্তমানে অবাধ যাতায়াত।...কালগত ব্যবধান সত্ত্বেও মানবিক আবেগের ধর্ম যে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে সম্ভবত এই কথাই 'অদ্ভুতরসাত্মক' নাটকে মুনীর চৌধুরী রঙ্গচ্ছলে বলতে

চেয়েছেন।...তবে স্বীকার করতে হবে—আঙ্গিকের অভিনবত্ব সত্ত্বেও 'দণ্ডকারণ্যে' বার বার পট-পরিবর্তনের ফলে নাট্যরস কোনো চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করতে পারেনি।[৬০]

আলোচ্য নাটকে মুনীর চৌধুরী এক সেট চরিত্র দিয়েই পুরাণ এবং সমকালের মধ্যে মানবিক প্রবৃত্তির সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। পুরাণ কাহিনীর সঙ্গে সরক্ত সমকালের সাদৃশ্য আবিষ্কার এবং তার ব্যতিক্রমী উপস্থাপনায় 'দণ্ডকারণ্য' বিশিষ্ট এবং বাংলা নাটকের ধারায় বাতিক্রমী সৃষ্টি। এক ধারায় নাটকের কাহিনী বর্তমান কালের, এর ঘটনা ঘটছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-নিবাসে এবং কনভোকেশন হলে। অন্য ধারায় সমান্তরাল বিন্যাসে কাহিনী-স্রোত প্রবাহিত হয়েছে রামায়ণের জগতে, ঘটনা ঘটেছে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-শূর্পণখাকে নিয়ে বিস্তৃত-অরণ্য দণ্ডকারণ্যে। কাল আর পটভূমি বদলে নিলেই এ-নাটকে মনোয়ার হয়ে যায় রাম, কায়সর লক্ষ্মণ, লায়লী-ওয়াফা সীতা-শূর্পণখা আর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বসে শ্রুতিময় দণ্ডকারণ্যের আরণ্যক মেলা।

আলোচ্য নাটকে পুরাণ এবং সমকালের মধ্যে যোগসূত্র নির্মাণ করেছে প্রেম-ভালবাসা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, কামনা-বাসনা নামের মানবিক প্রবৃত্তিসমূহ। মানবিক প্রবৃত্তির আদিম মৌলিকতা পুরাণের পাতা ছিঁড়ে সমকালেও সমান-মাত্রায় থাকে সঞ্চরণশীল। এই সূত্রেই এ-নাটকে পুরাণ আর সমকাল মিলে-মিশে হয়ে গেছে একাকার! দণ্ড-কারণ্যের আরণ্যক অশুভ-সত্তা, আদিম প্রতিহিংসা, মূল্যবোধহীন প্রেম শূর্পণখার নাসিকা কর্তন করে পরিতৃপ্ত হয়নি; তাই বাংলাদেশের ষাটের দশকেও সেই আদিম আরণ্যকতা লক্ষ্মণ-সত্তার সমকালস্পর্শী রূপ কায়সরের উচ্চারণে উঠে এসেছে এভাবে:

কায়সর। আমি কায়সর নই। আমি অন্য কেউ। আমি ওয়ারীর সেই ছাত্র যে চলন্ত রিকসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোনো পরীক্ষার্থিনীর নাসিকা কর্তনের জন্য। মোমেনশাহীর সেই যুবক যে সৎমার প্রথম পতির কন্যার জন্য দিওয়ানা হয়ে মধ্য রাতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে প্রিয়তমার নাক ঘচাৎ করে কেটে উধাও। আমি দেবদাস, পার্বতীকে প্রহার করি। আমি প্রমথেশ বড়ুয়া যমুনাকে আঘাত করি।

আমি রাক্ষস। আমি দণ্ডকারণ্যের বাসিন্দা। আমি রামানুজ। আজ্ঞাবহ। প্রতিশ্রুত। খুঁজছি। আমি শূর্পণখার নাসিকা কর্তন করেছি। দণ্ডকারণ্যে আমি নাসিকা চাই। সুকর্তিত রক্তোজ্জ্বল নাসিকা। লায়লী, প্রস্তুত, হও।[৬১]

গঠনশৈলীতে 'দণ্ডকারণ্য' স্পষ্টতই অভিনব, নিরীক্ষাধর্মী, দ্বিমাত্রিক, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুত-রসাত্মক। নাট্যকার-কথিত 'অদ্ভুত-রসাত্মক' বৈশিষ্ট্যের অন্তরালে সমালোচক খুঁজেছেন এ্যাবসার্ড-ধর্ম। বস্তুত অদ্ভুত, অসম্ভব কিংবা উদ্ভট শব্দ-ত্রয় কখনো-কখনো প্রায়-সমার্থক। মুনীর চৌধুরী সরাসরি এ্যাবসার্ড ধর্মের কথা বলতে চাননি, কারণ ঐ শিল্প-প্রকৌশল সম্পর্কে তাঁর তখনো ছিল এক ধরনের দ্বিধা। তাই ১৯৬৪ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক নাট্য-সেমিনারে এ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম জনক ইউজীন ইয়োনেস্কোর সান্নিধ্যে এসে এ্যাবসার্ড নাটক রচনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেও, ১৯৬৫ সালে তিনি লেখেন :

> এই আধুনিক নাটকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। তবু পৃথিবী প্রতিদিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। সংস্কৃতির দুনিয়া তো, বটেই। পশ্চিমী নাটকের এই নবরূপের আস্বাদন কী আমাদের চেতনায়ও বিবর্তন ঘটাবে। সে বিবর্তন কী আমাদের জন্যে সত্য হয়ে উঠতে পারবে। পারলে কী তা কাম্য বলে পরিণত হবে। কেবল প্রশ্নই করা যায়, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ না করা অবধি উত্তর অনিশ্চিত হতে বাধ্য।[৬২]

মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা-ভালোবাসা, অপ্রাপ্তির বেদনা এবং দুর্ভর যন্ত্রণার শিল্পপ্রমূর্তি নির্মাণ এ্যাবসার্ড-রীতির অন্যতম লক্ষণ। দণ্ডকারণ্যে আছে এ্যাবসার্ড নাটকের এই চারিত্র-বৈশিষ্ট্য। অপ্রাপণীয়ের জন্য যন্ত্রণা এই নাটকের সবগুলো চরিত্রকেই ভাবনায় করে তুলেছে আপাত-অসংলগ্ন; তাদের মধ্যে এসেছে সত্তাবিচ্ছিন্নতার সুর, কখনো-বা তাদের আচরণ-অবয়ব বিচূর্ণতা-বিভঙ্গতার পথে পা বাড়িয়েছে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ-পটভূমির কাঠামোতে ইউনীন ও'নীল যেমন গ্রীক মীথের পুনর্নির্মাণ করেন *Mourning Becomes Electra* (১৯২০) নাটকে, তেমনি মুনীর চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের

জটিলতার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে রামায়ণ-মীথ ভেঙ্গে দেন। তাই বাল্মীকির রাম-সীতার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর রাম-সীতার ব্যবধান আকাশ-পাতাল। একদিকে মানুষের প্রেম-প্রবৃত্তির আবহমান এবং চিরায়ত রূপ নির্মাণ ; অপরদিকে প্রেমের অঙ্গনে লাক্ষ্মণিক অমানবিকতা-বর্বরতার চিত্র-অঙ্কন—আলোচ্য নাটকে মুনীর চৌধুরীর এই-ই ছিল কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

'দণ্ডকারণ্য' নাটক যেহেতু দ্বৈত-স্রোতের অন্তর্বয়ন, তাই সংলাপ নির্মাণে নাট্যকারের পরীক্ষা ছিল অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ দ্বৈতসত্তাময় একই অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে আড়াই হাজার বছর ব্যবধানের সময়সীমা, যুগ-প্রতিবেশ, সামাজিক রুচি, কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রধানত সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। তাই লক্ষ্য করবো সমকাল-উদ্ভাসী অংশের সংলাপ যেখানে প্রাত্যহিকতাস্পর্শী, সেখানে রামায়ণ-অংশের সংলাপ প্রাচীনতা-আশ্রয়ী, তৎসম-শব্দবহুল এবং অভিজাত। যেমন :

ক. মঞ্চ — দণ্ডকারণ্য

সাধু　　অধৈর্য হয়ো না। অরণ্য কাউকে নিরাশ করে না।

রাম　　অসহ্য এই অরণ্যের স্তব্ধতা, উদ্ভিদের এই অপ্রতি-রোধ্য বিস্তার। শুধু ফুল আর ফল, বৃক্ষ আর মৃত্তিকা, বনভূমি আর লতাগুল্ম! গাছের মাথায় পাখী, মধ্যে বানর, পাদমূলে তপস্বী—ক্ষমা করবেন—নাগরিক রসনার পাপপূর্ণ তাড়নায় কী অসঙ্গত কথা বলে ফেললাম।

সাধু　　আমি তোমার বাক্যে কর্ণপাত করিনি। তোমার অন্তরের যন্ত্রণাকে লক্ষ্য করছিলাম। তুমি নিশ্চিত হও বৎস। আর এ-ও জেনে রাখ, নগরে আর অরণ্যে ভেদ অতি সূক্ষ্ম। তোমার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রবেনা। অরণ্যও কম বিঘ্নসংকুল নয়।[৬৩]

খ. মঞ্চ—　বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

ওয়াফা.　　তুমি আমায় জড়িয়ে ধরেছিলে কোন্ সাহসে?

মনোয়ার আমি তার জন্য মাফ চাইছি। হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে যাই। মনে হল যেন ধরা পড়ে যাব। আমার হাতের কাগজগুলো ওদের কেউ হয়তো দেখে ফেলেছে। ভীড়ের মধ্যে অন্য উপায় ছিল না।

ওয়াফা আমারও বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কন্‌ভাকেশনের মহড়ায় এত হট্টগোল হতে পারে কল্পনাও করিনি।... পাগল হয়ে যাবার যোগাড়।[৬৪]

মঞ্চ-পরিকল্পনায় মুনীর চোধুরী বাংলা নাটকে মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। 'কবর' নাটকে মঞ্চ-বিন্যাসে তাঁর বিশিষ্টতা ও মৌলিকতা সহজেই লক্ষণীয়। 'দণ্ডকারণ্য' নাটকের মঞ্চ-বিন্যাস 'কবর'-এর চেয়েও সাহসী প্রয়াস, কারণ একই মঞ্চে আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানময় দুই প্রতিবেশ নির্মাণ ছিল দুরূহ পরীক্ষা। কিন্তু মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং দৃশ্য-সজ্জায় উদ্ভাবনী শক্তি এবং আলোক-বিন্যাসের বৈচিত্র্যে এই পরীক্ষায় মুনীর চৌধুরী বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছেন। অভিনয়ের সঙ্গে মুনীর চোধুরীর সরাসরি সম্পর্ক এবং জাতিক-আন্তর্জাতিক মঞ্চ-অভিজ্ঞতা তাঁর নাটকে মঞ্চকলা সৃষ্টির পশ্চাতে সর্বদা ছিল সক্রিয়।

ব্যতিক্রমী মঞ্চ-পরিকল্পনা এবং একই অভিনেতা-অভিনেত্রীর দ্বৈত-সত্তার কারণে, অনেক সমালোচক, 'দণ্ডকারণ্য'-এর মঞ্চ-সফলতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং এ-কারণেই উল্লেখ করেছেন এর নাট্যরসগত সীমাবদ্ধতার কথা। একদা এই সন্দেহের কথা রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' (১৯২২)-'রক্তকরবী' (১৯২৬) নাটকের বেলায়ও উচ্চারিত হয়েছিল। প্রাগ্রসর প্রযুক্তির যুগে এই সন্দেহপ্রকাশ অমূলক এবং চরিত্রের দ্বৈতসত্তার যথার্থ প্রকাশ পাত্র-পাত্রীর অভিনয়ের সূক্ষ্মতার ওপর নির্ভরশীল। মঞ্চ এবং অভিনয়কলার সঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সম্পর্ক যেহেতু ছিল নিবিড়, তাই আমরা ধরে নিতে চাই, নাটকে এই ব্যতিক্রমী মঞ্চ-নির্মাণ তার সচেতন প্রয়াস, সাহসী পরীক্ষা।

প্রকরণশৈলীর অভিনবত্বে ব্যতিক্রমী বিষয়-আশ্রয়ী 'দণ্ডকারণ্য' বাংলা দেশের নাট্যসাহিত্যের এক সাহসী নির্মাণ। এই নাটকের অস্থিতো

প্রবহমান আছে মীথ, আর শোণিতে সমকাল। অবয়ব-কৌশলের এই ব্যতিক্রমী পরীক্ষায় বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে মুনীর চৌধুরী পথিকৃৎ-নাট্যকার।

৭

উপর্যুক্ত পঞ্চ-প্রতিভার সচেতন-প্রয়াসে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে নবতরঙ্গ। মেধাবী, আন্তর্জাতিক-মনস্ক, জাতীয়-সত্তা-সচেতন এবং পরিস্রুত-সদর্থক জীবনভাবনায় বিশ্বাসী এই পাঁচজন নাট্যকারের মধ্যে একটি সাদৃশ্য-ধর্ম আবিষ্কার করা যায়। নাটকে নবতরঙ্গ সৃষ্টির পিছনে এঁদের সকলেরই জাতিক-আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রায় পূর্ণ জীবনটাই কাটালেন ইউরোপের নাট্যনগরী প্যারিসে। মুনীর চৌধুরী এবং সাঈদ আহমদ ব্যাপকভাবে ঘুরেছেন আমেরিকা-ইউরোপ; বিশ্ব নবনাট্যান্দোলনের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় মুনিবিড়। সিরাজুদ্দার আবু জাফর এবং নূরুল মোমেনের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের বিবেচনায়, প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-মনস্কতা এবং ব্যাপক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার কারণে এঁরা আমাদের নাট্যসাহিত্যে আনতে পেরেছেন নবজীবনচেতনা এবং প্রাগ্রসর নির্মাণকলা।

তথ্যনির্দেশ

১ নূরুল মোমেন, নেমেসিস, ১৯৪৮, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৬২, মোমেন পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ২।

২ নেমেসিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩ নেমেসিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৪ দ্রষ্টব্য : 'পূর্বাভাষ', নেমেসিস, পূর্বোক্ত।

৫ 'নেমেসিস' গ্রন্থের প্রথম দিকে মুদ্রিত আছে সজনীকান্ত দাসের এই মন্তব্য।

৬ ঐ।

৭ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭১, এ. মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, পৃ. ৬৯৩

৮ কবীর চৌধুরী, "আমাদের নাটকে নবতরঙ্গ", 'সুন্দরম' (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শীত ১৩৯৩, ঢাকা, পৃ. ২

৯ মুহম্মদ মজির উদ্দীন, বাংলা নাটকে মুসলিম সাধনা, ১৯৭০, নর্থ বেঙ্গল পাবলিশার্স, রাজশাহী, পৃ. ৩৯৭ এবং ৪০৬

১০ দ্রষ্টব্য : 'পূর্বাভাষ', নেমেসিস, পূর্বোক্ত।

১১ পূর্বোক্ত।

১২ নেমেসিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

১৩ নেমেসিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬৪

১৪ Christopher Marlowe, *The Tragedy of Doctor Faustus*, A Folger Library General Reader's Edition, London, 1959, p. 77

১৫ নেমেসিস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

১৬ সাঈদ আহমদ-এর নাটক চারটির নাম—'কালবেলা' (রচনা-১৯৬১, মঞ্চায়ন ১৯৬২, পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৬৩, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৭৬), 'মাইলপোস্ট' (১৯৭৬), 'তৃষ্ণায়' (১৯৭৬) এবং 'প্রতি-দিন একদিন' (১৯৭৮)। প্রথম নাটকত্রয় ইংরেজি ভাষাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

১৭ "All Rounder With Style", *South-China Morning Post*, Hongkong, 27th October. 1978.

১৮ দ্রষ্টব্য : কালবেলা নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, ১৯৭৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯ কবীর চৌধুরী, "আমাদের নাটকে নবতরঙ্গ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২০ আতাউস সামাদ, "দুরূহ নাটকের মঞ্চসাফল্য", 'পরিক্রম' (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রফিকুল ইসলাম), দ্বিতীয় বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬২, ঢাকা, পৃ. ৮২

২১ Martin Esslin, *The Theatre of the Absurd*, 1961, Revised and Enlarged Edition 1968, Penguin Books, p. 402

২২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৩

২৩ কবীর চৌধুরী, এ্যাবসার্ড নাটক, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৩-৯৪

২৪ Martin Esslin, ibid, p. 406

২৫ দ্রষ্টব্য : 'কালবেলা' নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা, পূর্বোক্ত।

২৬ কালবেলা, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২৭ স্যামুয়েল বেকেট, গডোর প্রতীক্ষায় (অনুবাদ : কবীর চৌধুরী), ১৯৮১, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ১১৬-১৭

২৮ কালবেলা, সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০-৪১

২৯ Martin Esslin, ibid, p. 393

৩০ Quoted by Arnold P. Hinchliffe in *The Absurd*, 1969, Methuer and Co. Ltd., London, p. 67

৩১ কবীর চোধুরী, ইউরোপের দশ নাট্যকার, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৭

৩২ 'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটকটি সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। আমরা বর্তমান আলোচনায় 'সমকাল' পত্রিকার পাঠ গ্রহণ করেছি। নাটকটি পরে ১৯৭২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৩৩ C. S. Lewis, *The Allegory of Love*, 1936, Oxford University, 1979 Edition, p. 48

৩৪ William Flint Thrall and Addison Hibbard (Revised & Enlarged by C. Hugh Holman), *A Handbook To Literature*, 1962, The Odyssey Press, Newyork, p. 8

৩৫ সিকান্দার আবু জাফর, শকুন্ত উপখ্যান, 'সমকাল', পঞ্চম বর্ষ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৮ সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ২২৪

৩৬ শকুন্ত উপাখ্যান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

৩৭ সৈয়দ আকরম হোসেন, "ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা", বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৫৭

৩৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকগুলোর নাম—'বহিপীর' (১৯৬০), 'তরঙ্গভঙ্গ' ('একটি বিচারকের কাহিনী' নামে পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৬২, গ্রন্থাকারে 'তরঙ্গভঙ্গ' নামে প্রকাশ ১৯৬৫), 'সুড়ঙ্গ' (১৯৫৫ সালে 'সংবাদ-এর স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রকাশ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬৪), এবং 'উজানে মৃত্যু' ('সমকাল' পত্রিকায় প্রকাশ ১৯৬৩, এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি)।

৩৯ নীলিমা ইব্রাহিম, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, ১৯৭২, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ৪৮৫

৪০ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), ১৯৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮৩, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃ. ৪১৩

৪১ কবীর চৌধুরী, "আমাদের নাটকে নবতরঙ্গ", পূর্বোক্ত, পৃ. ৪-৫

৪২ বেগম আকতার কামাল, "তরঙ্গভঙ্গ : একটি অভিব্যক্তিবাদী নাটক", 'সাহিত্য পত্রিকা' (সম্পাদক—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান), ষড়্‌বিংশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শীত ১৩৮৯, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৩৮

৪৩ উদ্ধৃত : গঙ্গাপদ বসু, নাটক ও নাট্য-আন্দোলন, ১৯৭২, আনন্দ-ধারা প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১২৪

৪৪ William Flint Thrall and Addison Hibbard, *A Handbook to Literature*, ibid, p. 196

৪৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, তরঙ্গভঙ্গ, ১৯৬৫, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদক—সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৭২-৭৪

৪৬ তরঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯০

৪৭ কবীর চৌধুরী, এ্যাবসার্ড নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

৪৮ বেগম আকতার কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৪৯ Quoted by Thomas E. Sanders in *The Discovery of Drama*, 1968, Scott, Foresman and company, U. S. A., Pp. 518-19

৫০ তরঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯১

৫১ তরঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৭-৫৮

৫২ তরঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৭

৫৩ তরঙ্গভঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

৫৪ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, "মুনীর চৌধুরীর নাটক", বাংলাদেশের নাট্যচর্চা (সম্পাদক—রামেন্দু মজুমদার), ১৯৮৬, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৮৮

৫৫ 'দণ্ডকারণ্য' (১৯৬৬) নাটগ্রন্থে মোট তিনটি একাঙ্কিকা আছে—'দণ্ড' 'দণ্ডধর' এবং 'দণ্ডকারণ্য'। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে কেবল 'দণ্ডকারণ্য' বিচার করেছি।

৫৬ মুনীর চৌধুরী, 'দণ্ডকারণ্য' (দ্র. ভূমিকাংশ), ১৯৬৬, মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (সম্পাদক—আনিসুজ্জামান), ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২০০ ঘ।

৫৭ আনিসুজ্জামান (সম্পাদক), মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৯৮২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্রষ্টব্য : ভূমিকাংশ, পৃ. পনের।

৫৮ কবীর চৌধুরী, এ্যাবসার্ড নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৫৯ রফিকুল ইসলাম, "আজাদী-উত্তর নাট্যসাহিত্যে নাগরিক চেতনাবোধ", 'এলান', ঈদ সংখ্যা ১৯৬৮, পৃ. ২৮। উদ্ধৃত : মুহম্মদ মজির উদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৬

৬০ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, "মুনীর চৌধুরীর নাটক" পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

৬১ দণ্ডকারণ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

৬২ উদ্ধৃত : আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৬৩ দণ্ডকারণ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫

৬৪ দণ্ডকারণ্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯